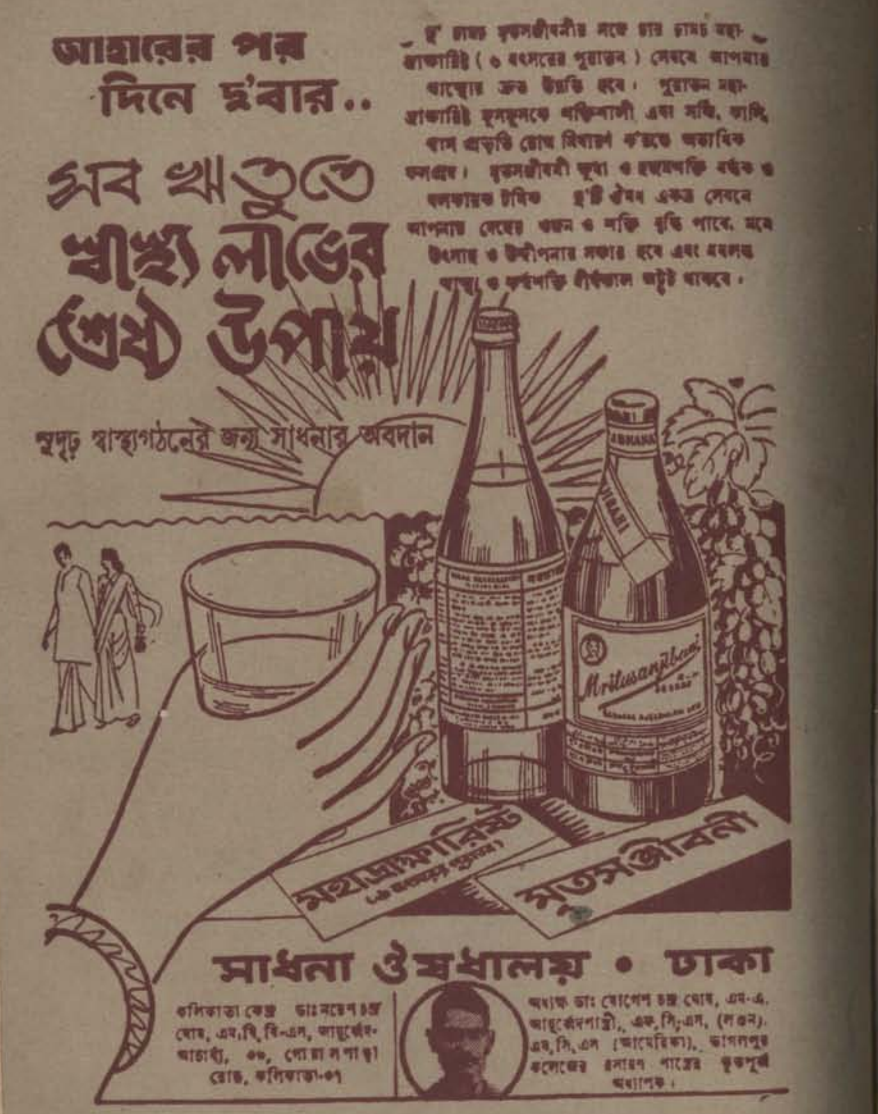


দাম: এক টাকা



পরিচয়

চৈত্র ১৩৬৯

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ভারতীয় শিল্পী ও সমকালীন শিল্প

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতিতে রঙ লেগেছে, আকাশে মেঘের খেলা, বাতাসে আমেজ। বর্ষণে ধোয়া প্রকৃতির বুক জুড়ে ঘন সবুজের মেলা—নীল আকাশের শুভ্র মেঘের পশ্চাদ্‌পটে—সবুজ রয়েছে বুক জুড়ে। মাঠে-ক্ষেতে ঢেউ-এর দোলায় দোলন-লাগা ধানের মাঝে ঐ যে লাল শাড়ীর আঁচল ঢাকা কালো হরিণ-চোখ, খাল-বিলের ঘোলা জলে নৌকা-ডোঙার সারি, পানকৌড়ি, সাদা বকের চাঞ্চল্য—এমন প্রকৃতির একটি টুকরো আজকে ক্রমেই আমাদের চোখে দুষ্প্রাপ্য। ধূ-ধূ মাঠের দূর কোণে গাঁয়ের বুকে সেদিনের মানুষের মনে যা দোলন জাগাত, আজকে তা কল্পনার আলপনায় আঁকা দূর-দূরান্তের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। সেখানে এখন যন্ত্রদানবের রাজ্য—দ্রুত, আরো দ্রুত চলার গতি বাড়ছে। হাটার ছন্দে দৌড়ের যুগ। এতদিনে বুঝি পশ্চিমী সংস্কৃতির ঝড়ের পরশ লেগেছে আমাদের আশেপাশে। মনের কোণের জমে থাকা মধ্যযুগের আবহাওয়া এ দুরন্ত ঝড়ে টলোমলো—সংস্কৃতির রূপ বদলাচ্ছে।

শহর আমাদের গ্রাস করেছে, দিকে দিকে শুরু হয়েছে যন্ত্রপূজা। গ্রামীন বাংলার আনন্দমেলায় যন্ত্রদেবতাও কোল জুড়ে বসেছে আপন দাবিতে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নীল আকাশের ভাসা মেঘে কালিমার ছোঁয়া! আকাশ সীমান্তে চিমনীর সারিতে উর্ধ্বরেখায় গগন ছোঁয়ার স্পর্ধা। ধাপে ধাপে, মাথায় মাথায়, উঁচু থেকে আরো উঁচু, বাড়ির পর বাড়ি। পথে-ঘাটে, ছাদে-ছাদে, তারে-তারে, জালে-জালে আবদ্ধ প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বুকে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা। খাওয়া-পরা-থাকা-বাঁচার পরও আরো কিছু—অন্য কিছু চাই তার। বারে বারে, দলে দলে, নবযন্ত্রের নতুন ছন্দে, কণ্ঠে কণ্ঠে একই পূজোর

বাণী—"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।" শহর আজ হাঁপিয়ে উঠেছে—শ্রান্ত তার নাগরিক-নাগরিকা, মনে চিরন্তন প্রশ্ন—'কা পন্থা ?'

এমন যে ক্ষণ, এমন দুঃসহ মুহূর্তেই বুঝি মানুষ সৃষ্টি করে কথা-ছন্দ-গান-ছবি-প্রতিমা-নাটক। বাঁচার চাহিদা মিললেই ঘটে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। এ সংস্কৃতি একদিন রূপে রসে বিকশিত হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল গ্রামীন বাংলায়। তার পরিচয় আজও কিছু মনের গহনে লুকিয়ে আছে, খুঁজলে হয়তো হদিস মেলে তার। তবু এ যন্ত্র যুগের যন্ত্র পূজায় যেমন প্রাণে জেগেছে নতুন ছন্দ, তেমনি মনেও জেগেছে নতুনের আহ্বান। বাউল-কবি, যাত্রা-নাটক বা পটুয়ার দীঘল পটের গণ্ডী পেরিয়ে, পূজো-অর্চনার আসর-আলপনার যুগ কাটিয়ে নতুন প্রকাশের চাহিদা জানিয়েছে নতুন শিল্পীর কাছে। তাই নতুন কবি, নতুন নট, নতুন চিত্রকর সৃষ্টি করছে যন্ত্রযুগের নবীন শিল্প।

এ সৃষ্টির শেকড় রয়েছে মধ্যযুগের গভীরতায়। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে যন্ত্রযুগের ট্রাক্টরে-চষা এমোনিয়া সারে উর্বর জমির বুকে। তাই তার গোড়ায় পরম্পরার পরশ থাকলেও আগায় ফুটেছে অচেনা ফুল। এ ফুলকে চিনতে হলে, এর গন্ধ উপভোগ করতে গেলে, প্রয়োজন হবে নতুন প্রস্তুতি, নতুন শিক্ষা। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, এমন কি বিদ্যাসাগরী বাংলা আজ যেমন কানে জানায় অজানা ধ্বনি, ভুলে যাওয়া সে অতিপরিচিত ভাষার প্রকাশ পড়তে গেলে, জানতে হলে, যেমন প্রয়োজন হয় বিশেষ অনুশীলনের, তেমনি নবীন এ শিল্প-ভাষা, যন্ত্রযুগের অতিব্যস্ত মানুষের ভুলে-যাওয়া শিল্প কথা—চিত্রলেখা পড়তে গেলে প্রয়োজন হবে বিশেষ অনুধাবনের। লেখ্য-ভাষার মতো চিত্র-ভাষারও পঠন-পাঠন, শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ রীতি আছে। গ্রামীন যুগের ফেলে-আসা দিনে যুগ যুগ অনুশীলনের ফলে অজানিতে সেদিনের শিল্প ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমাদের মনে মনে, মজ্জায় মজ্জায়। তাই সেদিন পোটোর পট, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সরা, দশ অবতার তাস আনন্দে দেখেছি। সামর্থ্য অনুসারে দাম দিয়ে কিনেছি, প্রাণ ভরে পূজো করেছি, মন ভরে খেলেছি, অজানিতে উপভোগ করেছি তার রঙ-রূপ-রেখার ছন্দ। আজকে এ নতুনের অনুপ্রবেশে সে-পরম্পরা হয়েছে ব্যাহত। স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগের সীমার হয়েছে সীমান্ত। তাই এ শিল্পের রসবোধের জন্য দুটি পন্থা ছড়িয়ে আছে সামনে। হয় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে বারে বারে দেখে দেখে অজ্ঞানে অজানিতে এ শিল্পবোধের অনুপ্রবেশ ঘটবে আমাদের মনে—তবে তার সময়ের পরিধি

অজ্ঞাত। নাহলে এ নবশিল্প অভ্যুত্থানের সমতালে অনুসন্ধিৎসু মনে, বিষয় গুরুত্বের প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষার পাঠ নিয়ে সে সময়কে সীমায়িত করতে হবে।

যন্ত্রযুগ যেমন বিশেষজ্ঞের যুগ, অংশ-সিদ্ধির যুগ—যন্ত্রে, যন্ত্রে অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে যেমন পরিপূর্ণ হয় সৃষ্টি, সৃজিত হয় নবীন সামর্থ্যে সফল নতুন যন্ত্র, তেমনি আজকের শিল্প, আজকের চিত্র অংশে অংশে ভেঙে গেছে, ছড়িয়ে গেছে শিল্পীতে শিল্পীতে। আজকের ছবি সমকালীন চিত্র। তাই শিল্প ষড়ঙ্গের রূপায়নে শিল্পীতে শিল্পীতে বিভিন্নতর প্রকাশ। কেউ রেখাবিদ, কেউ বর্ণ বিচক্ষণ, কেউ প্রমাণ-অভিজ্ঞ। কারোর ছবি ভাবালম্বী, কারো প্রকাশ রূপে, লাবণ্য কারো প্রকাশ মাধ্যম। তাই আজকের শিল্পে সম্পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে না—শিল্পীতে শিল্পীতে অংশে অংশে পূর্ণাবয়ব দেয় যুগকে। আজকের যুগ গোষ্ঠীর যুগ, সমষ্টির যুগ, একতার যুগ, তাই তার সম্পূর্ণতা ঘটে সমন্বয়ে। শিল্পে প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর আমাদের এই নতুন-জাগা দেশে তার এই রূপ দুর্বল, আজও অচেনা। তাই একে চিনেও চিনতে পারছিনে। আজকের এই যে চেনা-অচেনার দোটানা, এমন শিল্পজিজ্ঞাসা, সে কথার শুরুতেই বলে রাখি এতে ইতিহাস আছে, ঘটনা আছে, যুক্তি ও বিচার চেষ্টা রয়েছে, তবু এ আলোচনা সমাধানের নির্দেশ না দিয়ে প্রশ্নেই শেষ।

এ যন্ত্রযুগের কর্মযোগী উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপ ; সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছিল আজকের এ সমকালীন চিত্র আন্দোলন। তাই তাকে বুঝতে গেলে, চেষ্টা করতে হবে সে দিনের সে স্থান-কাল-পাত্রে হদিস খোঁজার। তারপর সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে কেমন করে এদেশে এসে এমনতর রূপ নিল ; তারও গোড়ার ঠিকানা জানতে হবে। সেই সঙ্গে চিত্রকলার সামাজিক ভূমিকা এবং কার্য-কারণের সন্ধান জানা থাকলে আরও ভালো। আদিম যুগের আদি মানুষ অনুভব করেছিল সমষ্টিবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবীয় পশুশক্তি এ বিষয়ে তাকে সজাগ করেছিল। জীবনরক্ষার তাগিদেই মানুষ সম্ভবত চেষ্টা করেছিল ভাবের আদান-প্রদানে। অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছিল উপায় নির্ণয়ে।

মানুষ যেদিন অকৃত ধ্বনির কারণ অনুসরণে প্রকৃতি দেবীর আশীর্বাদ বা বিপর্যয়ের হদিস খুঁজে পেল, তখনই বুঝতে শিখলো ধ্বনি ভেদে ঘটনাপ্রভেদ। সেদিন হয়তো এমনতর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ সৃষ্টি করল, স্বকৃত ধ্বনি বা

উদ্দেশ্যজ্ঞাপক শব্দ। তারপর এক কৌম বা গোষ্ঠীতে একই উদ্দেশ্যে সৃজিত ধ্বনি বার বার উচ্চারিত হয়ে ক্রমে ক্রমে তার বিশেষ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করল, সৃষ্টি হলো কথ্য ভাষা। ক্রমে মানুষ গোষ্ঠী সচেতন হলো, জীবনরক্ষার প্রয়োজন তাকে আরো সঙ্ঘবদ্ধ করল, তখন সে বুঝতে পারল সীমাবদ্ধ ধ্বনিশক্তি আপন গোষ্ঠী বা প্রতিবেশী ছাড়া অন্যের কাছে ভাব প্রকাশে অক্ষম। প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষের বুদ্ধি এবার তাকে সাহায্য করল শ্রবণজাত ধ্বনি শক্তির সীমান্বিত ক্ষমতাকে নির্ভর না করে, দর্শনজাত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে। কথ্য ভাষার অসম্পূর্ণতাকে চিত্রায়িত প্রতীকের সাহায্যে পূরণ করতে। প্রয়োজনে মানুষ শিখলো চিত্রভাষা। সৃষ্টি হলো লেখ্যভাষা ও চিত্র।

দর্শনজাত অভিজ্ঞতা, শ্রবণগ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ভিন্ন—একটি প্রত্যক্ষ আর একটি অপ্রত্যক্ষ। এর কারণ দুটি ইন্দ্রিয়ের গঠন পার্থক্য। আমাদের চোখের ভেতরের দিকে মাঝের অংশ রেটিনা (Retina) তার কেন্দ্রে 'ফভেয়া সেণ্ট্রালিস (Fovea Centralis) তারই কেন্দ্র স্থলে যে ছবিটুকু পড়ে সেইটুকুই স্পষ্টতম। মধ্যে রেটিনার অংশে যে ছবিটুকু থাকে সেটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। এই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দর্শন প্রথমে মস্তিষ্কের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। ক্রমে শরীরের বহুস্থানের বহু স্নায়ুকে উত্তেজিত করে সৃষ্টি করে বহু রকমের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা। এবং শ্রবণজাত স্নায়বিক উত্তেজনার থেকে দর্শনজাত উত্তেজনা দ্রুততর, কারণ শব্দযন্ত্রের স্নায়ুগুলির চেয়ে, দর্শনযন্ত্রের স্নায়ু একশত গুণ পুষ্টতর, স্বভাবতই তার গ্রহণশক্তি অধিক। তাই শ্রবণজাত উত্তেজনা অনুভব করার জন্যে অনুমান ও অনুপাত সংগ্রহের সময় বেশি লাগে। আবার এই দর্শনজাত জ্ঞান সংগ্রহ পন্থাগুলির মধ্যে চিত্রকলাই শ্রেয়তম, কারণ রেটিনা ও ফভেয়া সেণ্ট্রালিসে ঐ অস্পষ্ট ও স্পষ্ট দর্শনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে থাকে অপ্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয় অংশ। শিল্পী তার প্রজ্ঞার সাহায্যে অপ্রয়োজনীয়তা বর্জন করে প্রয়োজনকেই চিত্রায়িত করেন। যাত্রা, কথকতা এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি মিশ্রদর্শন বা শ্রবণজাত বৃত্তিগুলির অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ রেটিনা-বাহিত হয়ে স্নায়ুমণ্ডলে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিল্পীসৃজিত চিত্রে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিকতার অনুভূতিও সীমাবদ্ধ।

এই সব কারণে সুকুমারকলার বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এই চিত্র বিভাগটির

প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এ শক্তিমান বৃত্তি, মহাশিল্পীর হাতে যেমন মহৎকর্মে নিয়োজিত হয়, তেমনি অযোগ্যের হাতে পরিণত হয় পৈশাচিক ক্রিয়ায়। সমাজ-সচেতন প্রতিটি মানুষের যেমন দায়িত্ব আছে, সমাজের সুপরিবেশিত রূপ-রস-গন্ধ যথাযোগ্য উপভোগের, তেমনি, কুরূপ, বিরস এবং অপগন্ধের প্রচার প্রসার নিয়ন্ত্রিত করারও দায়িত্বও রয়েছে তাঁদের। রস-সচেতনতাই সম্ভব করতে পারে সে দায়িত্ব পালনে। রসিকদের ব্যক্তিগত মতামত, জ্ঞান দ্বারা শোধিত হয়ে, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে প্রয়োজনানুগ প্রকাশিত হয়ে শিল্প ও শিল্পীকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

সমকালীন ভারতীয় শিল্পে যে শিল্প ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তার যথার্থতার নির্ণয় প্রয়োজন। পাশ্চাত্যে প্রচলিত সমসাময়িক চিত্র ভাষার সঙ্গে এ ভাষার ঘনিষ্ঠতা দেখে রসিক মনে করেন, আজকের ভারতীয় চিত্র পাশ্চাত্যের অনুকৃতি। সমকালীন চিত্রকরদের এক অংশের মতে এ ভাষা আন্তর্জাতিক, আর এক অংশ মনে করেন ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা ব্যবহৃত বলে এ চিত্রভাষা অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতীয়। স্বল্পজ্ঞানী সৌখিন সংগ্রাহক চিত্রের সাথে পরিবেশ ও আসবাবের বর্ণ সমতা মিলিয়েই ক্ষান্ত। বৃত্তিজীবী সমালোচক বৃত্তি উপার্জনের প্রয়োজনে চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। এমন মুহূর্তে স্বভাবতই, সাধারণ বুদ্ধি কুয়াশাচ্ছন্ন ও প্রচারবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ যুক্তি-নির্ভর তত্ত্ব আলোচনা। সে চেষ্টায় আলোচনার দরকার, সমকালীন চিত্র আন্দোলনের উৎস সন্ধান।

উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ইওরোপে সাধারণ শিল্প সংজ্ঞা ছিল, "Art is that which produces beauty". অর্থাৎ যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই শিল্প। তারপর ১৮৯৮ সালে টলস্টয়, 'What is Art?' বইটিতে এই প্রচলিত সংজ্ঞার পরিবর্তে নব মত প্রতিষ্ঠা করেন। "Art is a human activity consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them." অর্থাৎ শিল্প একটি মানবীয় কর্ম যার দ্বারা শিল্পী তার ব্যক্তিগত রসোপলব্ধিকে জ্ঞানযুক্ত কর্ম দ্বারা প্রকাশিত করেন। সে সৃষ্টি দেখে দর্শক শিল্পীর রসচেতনাকে নিজের মধ্যে খুঁজে পান ও উপলব্ধি

করেন। গ্রীকশিল্প-পরম্পরা থেকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যস্থষ্টির যে দায়িত্ব শিল্পকর্মকে এতদিন বহন করতে হয়েছিল, শিল্পগতভাবে তার মুক্তি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে হয়ে থাকলেও রসিকসমাজে এবং নন্দনতত্ত্বে তার সম্ভবত এই প্রথম স্বীকৃতি। গত যুগের শিল্পীর কাছে জনমনগোচর হওয়ার একমাত্র পন্থা সৌন্দর্য—নবীন শিল্পপ্রচেষ্টায় বাতিল হলো। তাঁরা অনুভব করলেন জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি সত্য, তা সে যত সুন্দর বা অসুন্দর হোক, শিল্প-মাধ্যমে তা পরিবেশনীয়। গ্রীসের ভেনাস, ইটালির ম্যাডোনা (র‍্যাফায়েল), মোনলিসার (দা-ভিঞ্চি) বদলে ফ্রান্সে চাষী দম্পতী (কুরবে), ধোপানী (দ্যমোর), শ্রমিক পরিবার (ভ্যানগগ্) ইত্যাদি উনবিংশ শতকের শেষের দিকে হলো শিল্পের বিষয়বস্তু। ইডেন উদ্যানের পরিবর্তে প্যারীর নিষিদ্ধ পল্লী এলো ছবির ক্যানভাসে। সুন্দর পেল নতুন সংজ্ঞা। তন্বী শ্যামা ম্যাডোনাকে যে সুন্দর বলতাম আর কর্মক্লান্ত প্রৌঢ়া ধোপানী বা নিষিদ্ধ পল্লীর সম্ভোগশ্রান্তা নারীদের যে সুন্দর বলি তার অর্থ ভিন্ন। সুসংবদ্ধ যৌবনের পরিপূর্ণতা এবং নারীর কমনীয় দৈহিক সৌন্দর্য যা ভেনাস অথবা যে কোনো যুগের নারীতে সম্ভব, তার শিল্পায়ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করলেই তা এই নতুন মূল্যায়নে শিল্প বা সুন্দর হয় না। শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত আবেগমণ্ডিত শিল্প-সৃষ্টি, বিষয়বস্তু তার যাই হোক না কেন, সেটি সুন্দর। কারণ দর্শক মনে শিল্পী সমআবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম, এ শিল্প-সৃষ্টি। সেদিনের শিল্পীগোষ্ঠীর মুখপাত্র টলস্টয়ের এ-মতবাদের সমর্থক ছিলেন সমসাময়িক জ্ঞানী গুণীজন। বার্নাড শ 'Pen Portraits and Reviews' পত্রিকায় টলস্টয়ের এই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "This is the simple truth : the moment it is uttered, whoever is conversant with art recognises in it the voice of the master." ১৯২০ সালে লেখা রজার ফ্রাই তাঁর রেট্রোস্পেক্ট প্রবন্ধে টলস্টয়ের ঐ কথা সম্বন্ধে লিখেছেন : "it, was Tolstoy's genius that delivered us from this impasse, and I think that one may date from the appearence of "what is art ?" The begining of fruitful speculation in aesthetics," মহৎ শিল্পী দেলক্রয়া তাঁর শেষ জীবনের চিত্রকর্মে এক নতুন পরীক্ষা সূচনা করে সৃষ্টি করেন সমকালীন চিত্র আন্দোলন। শুদ্ধ মূল বর্ণগুলিকে পৃথক ভাবে চিত্রে উপস্থিত করে দর্শন ইন্দ্রিয়ে মিশ্রণ সাধনে সচেষ্ট হলেন তিনি। শিল্পীর রঙ মিশ্রণ পাত্রে (প্যালেট)

মিশ্রিত রঙ প্রয়োগে চিত্রের মাধুর্যের চেয়ে দৃষ্টির মাধ্যমে বর্ণ মিশ্রণ অনেক বেশি উজ্জ্বলতর, এ পরীক্ষা সে সাফল্যের ইঙ্গিত দিল।

ইতিমধ্যে টলস্টয়ের যুগে ফ্রান্সের শিল্পীবৃন্দ সৃষ্টি করলেন নবীন চিত্রশৈলী ইমপ্রেসনিজিম বা মনোচ্ছায়াবাদ। ১৮৭৪ সালে ম্যানে, মনে, রেনোয়া, পিসারো প্রভৃতি এই রীতির অনুশীলনে সৃষ্টি করে চললেন নব নব চিত্র। সেজাঁর হাতে আরো সহজ হলো মনোচ্ছায়াবাদ। ১৮৮৫তে সুরা, সিগনা রাস্তা বদলে মনোচ্ছায়াবাদকে রীতিবদ্ধ ও বিজ্ঞানানুগ করার চেষ্টায় সৃষ্টি করলেন বিন্দুবাদ (পয়েন্টালিজিম)। সেজাঁ, সুরা, গঁগা, ভ্যান-গগ প্রভৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে মনোচ্ছায়াবাদ অনুসারী চিত্র সৃষ্টি করে, আর এক নবীন পন্থার হদিস দিলেন ; পোষ্ট-ইমপ্রেসানিজম বা মনোচ্ছায়া-উত্তরবাদ। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে গঁগা ও তাঁর অনুগামীরা যে রীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার নাম, সিম্বলিজিম ও সিনথেসিজম বা প্রতীকবাদ ও সমন্বয়বাদ। এমনি করে একের পর এক এলো নবী বা ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়। সেজাঁর তৈরি সহজ রাস্তা ধরে আঁরি মাতিশ সৃষ্টি করলেন ১৯০৫ সালে তাঁর মাত্র তিন বছর স্থায়ী শিল্পশৈলী বন্যতাবাদ (ফবিজিম)। ১৯০৮ সালে প্যাবলো পিকাশো সেজাঁর সরলীকৃত পন্থা অনুসরণে এবং তৎকালীন বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের অনুপ্রেরণায় এক নব্য চিত্ররীতি কিউবিজিম বা ত্রিকোণবাদ সৃষ্টি করে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক দ্বিমাত্রিক চিত্রের ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনার। এ চেষ্টায় শিল্পী ব্রাক ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং এ শৈলীর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। ১৯১০ সাল থেকে এ পন্থায় ক্রমে ক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে, কিউবিষ্ট হলো, ইটালি, রাশিয়া, হলাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি।

ক্রমে ক্রমে এলো, ইটালিতে ফিউচারইজিম বা ভবিষ্যবাদ, ফ্রান্সে এক্সপ্রেশানিজিম বা অভিব্যক্তিবাদ, একের পর এক আরো কত, তবে এরা হলো আরো ক্ষীণজীবী। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে প্যারিসে ১৯১৬ সালে চালু হলো ইম্‌প্রভাইজেশান, আমেরিকায় তার কিছু আগে শুরু হয়েছে সিনক্রোনিজম। এই সব মতবাদগুলির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য প্রথম মহাযুদ্ধের নিহত শহীদত্বে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২৪ সালে আবার নতুন করে শুরু হলো এক শক্তিশালী শিল্প আন্দোলন। কবি ও শিল্পী আঁন্দ্রে ব্রেথ সৃষ্টি করলেন সুররিয়ালিজিম বা বাস্তবোত্তরবাদ।

সমসাময়িক ইওরোপে মনোবিজ্ঞান গবেষণা দিকে দিকে চরম সার্থকতা

লাভ করছে। ফ্রয়েড, এডলার, ইয়ুং, প্যাবলভ প্রমুখ সার্থক মনোবিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ধাক্কায় চিরাচরিত নীতিবোধ ও মূল্যায়ন ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রযুগও দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বিকশিত হয়েছে নানা দিকে। এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ধনতন্ত্র-সৃজিত দানব ফ্যাসিজিমকে ধ্বংস করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো নানা দেশে। জীবনের মূল্যায়নপন্থা বিভক্ত হলো দুই ভাগে। এই উত্থানপতনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমতালে এগুতে না পেরে মানব মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো নানা সমস্যার ভারে। বিংশ শতকের শেষার্ধে আকাশ জয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে মানুষ এগিয়ে চলেছে মহাশূন্যে, যন্ত্রদানব যার হাতের ক্রীড়নক, সে আজ এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের মানুষের কাছে কৃপার পাত্র। কারণ তার মানসিক ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত। নিজের সৃষ্ট যন্ত্রদানবের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ক্ষুদ্র পৃথিবীকে সে তছনচ্ করে ফেলছে। তাই আজকের শিল্পে দুষ্প্রাপ্য সেদিনের সেই শিল্প সংজ্ঞাগুলি। এখানে নেই সে বাস্তবানুগতা, না আছে সে আঙ্গিক। সে জায়গায় খুঁজে পাই সমস্যাপীড়িত বিপর্যস্ত মানব মনের মনঃসমীক্ষণজাত প্রতিচ্ছবি।

এই যে নতুন শিল্পধারা, একে সাধারণভাবে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী। বহির্মুখী ধারা যুক্তি নির্ভরশীল। অন্তর্মুখী ধারা সম্পূর্ণ মনোজাগতিক। বহির্মুখী ধারার প্রকাশ দেখা যায় 'কিউবিজম' 'ফবিজম', 'সুর-রিয়ালিজম' প্রভৃতিতে। অন্তর্মুখী ধারা অবচেতন মনের সম্পদ, এই চিত্রশৈলী সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য শিল্পীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এ নতুন শিল্পধারা দুটির যথাযথ সংজ্ঞা এখনও নিরূপিত হয়নি। মাইকেল তাপে এর নাম দিয়েছেন—"Un-art autre" অর্থাৎ 'শিল্পভিন্নতা'। স্যার হার্বাট রীড অবশ্য এ নাম স্বীকার করেন নি। তাঁর মনে ১৯১০ সালে জার্মান প্রবাসী রুশশিল্পী কাণ্ডেনস্কির দেওয়া নাম composition বা অনুস্থাপন আরও যোগ্যতর।

আজকের বিমূর্ত চিত্রশৈলী এই অন্তর্মুখী ধারা অনুসরণে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। পর পর দুটো যুদ্ধ পেরিয়ে ইওরোপে আজও যে দু-চারটে অপেক্ষাকৃত পুরনো মতবাদ এখনও টিকে আছে, তা হলো ইমপ্রেসানিজিম, কিউবিজিম, দাদাইজিম, সুররিয়ালিজম এবং বিমূর্ত চিত্রশৈলী, অ্যাবষ্ট্রাক্ট শিল্প প্রভৃতি।

ইজিমের কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই অস্পষ্ট রয়ে গেল। মোট কথা এর দ্বারা এই কথাটাই আলোচনা করতে চেয়েছি যে, মাত্র পাঁচ-দশ বছর চলবার মতো যে সব মতবাদের প্রাণশক্তি নেই, তা অনুসরণ বা অনুকরণে ভারতীয় শিল্পী অজ্ঞতার ক্ষেত্রে কিছুটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হলেও অনুকৃতির কলঙ্ক এড়াবেন কেমন করে? প্রচার অভিভূত সমকালীন ইওরোপের মতো এমন রঙ ও ঢঙ মিলিয়ে মিশিয়ে, একটা নতুন নামকরণ করে হঠাৎ নামের ঝলকানী সৃষ্টি করা যায় হয়তো কিন্তু তাতে রসিকজন-মন জয় করা যায় না। তাছাড়া ইওরোপে যখন আধুনিকতম যন্ত্রযুগ চলছে, যেখানের মানুষ ঈশ্বরের আসনে বিজ্ঞানকে স্থান দিয়েছে এবং সমাজবাদও আজ যেখানে পরিণতির পথে অগ্রসর, সেখানের ব্যক্তিগত সমাজ, সমস্যা, নীতি ও মূল্যায়ন পারিপার্শ্বিক প্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আজকের ভারতে নিরক্ষরতা অপরিসীম, এখানে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যাবস্থা, বুভুক্ষু সংখ্যাতীত, দরিদ্র কৃষিজীবী প্রধান; শ্রমজীবী মুষ্টিমেয়। এখন ভারতবর্ষে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ভাগ্যই সুখ দুঃখের কারণ, ধর্মই ধারক। এই আকাশ-পাতাল প্রভেদকে উপেক্ষা করে, অগণিত দেশবাসীর জ্ঞানবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে, যাঁরা এদেশে এমন পাশ্চাত্যের অনুকৃতিক শিল্পরূপ আকাশকুসুম রচনা করছেন এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে যাঁরা বাহবা দিচ্ছেন তাঁদের এমন মানবেতর মনোবৃত্তি অনুকম্পার যোগ্য।

তবু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমকালীন চিত্র আন্দোলনের জগতে ভারতের দান স্বল্প নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ, মনোচ্ছায়া এবং ত্রিকোণবাদী মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় এবং বাঙালী। ইওরোপের ত্রিকোণবাদী শিল্পপ্রচেষ্টা যখন জ্যামিতিক নক্মা রচনার গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল, নিরস প্রতীক অনুস্থাপনই যখন তাদের প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছিল—ঠিক তখন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞার সাহায্যে সৃষ্টি করলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লেষণজাত নতুন ত্রিকোণবাদী শৈলী যা ভাব গাম্ভীর্যে এবং অলংকরণে অপরূপ।

"আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন শিল্পকলা সৃষ্টি করা, যা হবে ভাবালুতাহীন। পৌরুষদীপ্ত, সামর্থ্য-উজ্জল এবং শক্তিমান। এ শিল্প ধারার দুঃসাহসী পদক্ষেপ নব অভিযান শুরু করে হবে শক্তিধর পুরোধা। তবে তার দ্বারাই জনসাধারনের স্বভাব বিমুখতাকে জয় করে পুরুষানুক্রমিক গোঁড়ামি বিপর্যস্ত আজকের

ভারতের শিল্পকলার উদ্ধার সম্ভব হবে। সৃজনশীল প্রতিভার কাছে আমাদের এ শিল্পধারা হবে উত্তেজনাকর উত্তেজক ও সক্রিয় উৎসাহবর্ধক। এমন প্রতিভাই ভারতশিল্পের বন্ধন মুক্তি সম্ভব করবে।" এ কথাগুলি ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত আর্ট রেবেল সেণ্টারের শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণী পুস্তিকায় সংগঠকদের কর্মসূচীতে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতে ইওরোপীয় নব্য চিত্র আন্দোলনের প্রাথমিক অনুপ্রবেশের সময় তাকে যথাযথ ভারতীয়করণের জন্য এবং ভারতশিল্পের বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে যে কজন বিরল প্রতিভা সক্রিয় হয়েছিলেন তার মধ্যে শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায়-এর স্থান, গগনেন্দ্রনাথের পরেই প্রধান। তিনি আপন প্রতিভায় সক্রিয় শিল্পভাষা সৃষ্টিতে পথিকৃতের গরিমায় গৌরবান্বিত। তাঁরই অনুপ্রাণিত সে দিনের এ শিল্পপ্রচেষ্টা ও প্রদর্শনীতে সম্ভব হয়েছিল নব শিল্প আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল নবীন প্রেরনা। গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী গুলির পর গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্প প্রদর্শনীর এই প্রথম প্রচেষ্টা।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য সে দিনের এ প্রচেষ্টাগুলি সার্থক হয়নি। জনমনজয়ী সময়সাময়িক পরম্পরা অনুকৃতিক শিল্পধারার প্রতিবাদে তাই নবীনের এ বিদ্রোহ প্রতিকূল পরিবেশে বিপর্যস্ত হলো। তাই সে দিন নবীন প্রতিভার অভ্যুত্থানে বিচলিত বিভ্রান্ত রসিক সমালোচক বিপরীত পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল। আর্ট রেবেল সেণ্টারের কর্মতৎপরতায় সীমায়িত সাফল্যলাভ ঘটলো। প্রতিষ্ঠার কাছে বিদ্রোহী পথিকৃতের স্বাভাবিক বাধা লাভে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো, অজ্ঞের অসাড়তায় সংশ্লেষণবাদী নবীন এ শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে তার কর্মতৎপরতা সীমায়িত করে অভিমানে অপ্রত্যক্ষ নেপথ্যচারী হতে বাধ্য হলো। যুগান্তরের মুহূর্তে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা অস্বাভাবিক পরিবেশে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে বিপথগামী হলো। রক্ষনশীল ভারতীয়তা ঐতিহাসিক আগ্রহকে অগ্রাহ্য করে অজ্ঞাতে রোপন করলেন আপন সর্বনাশের বীজ।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পরাধীন ভারতের বিক্ষুব্ধ আত্মা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আপন ভবিষ্যৎ রচনা করছিলেন; সেদিনের সে বিদ্রোহ অনুসারী স্বতঃপ্রনোদিত যে শিল্প আন্দোলনের মুক্তি আকাঙ্খা বিপরীত পরিবেশে রুদ্ধ করা হলো, তার স্বাভাবিক প্রকাশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর স্বাধীন

ভারতে সম্ভব হলো না। কারণ স্বাধীন ভারতের আত্মসচেতন ভারতীয়তা দ্রুত সক্রিয় হলো নব-যুগলব্ধ প্রতিটি সুযোগ গ্রহণে। সামন্ততান্ত্রিক ও পরাধীন ভারত স্বাধীন হয়েই ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়কে অস্বীকার করে মুহূর্তে পেরিয়ে যেতে চাইলো সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে। দ্বিধাবিভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ সুবিধা লাভের সুযোগে যুগ যুগ সঞ্চিত তুঙ্গাশ্রয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবেশ নিমেষে পরিত্যাগ করে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলো নবীন ভারত। দিকে দিকে যোজনা-পরিকল্পনার পর্যায়ে পর্যায়ে দ্রুত শিল্পকরণের প্রয়োজনে বিভিন্ন মৌল যন্ত্র ও পরিকল্পনা-পরিচালনায় নির্বিচারে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ আমদানীর পথ ধরে সাংস্কৃতির লেনদেনও শুরু হলো প্রয়োজন অনুসরণ না করে প্রসাধনের তাগিদে।

সুকুমারকলা ক্ষেত্রেও এ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছে একইরূপে। কালজয়ী বিজ্ঞানের অবদানে ক্রমক্ষীয়মান পৃথিবীর পরিধি সে সুযোগ আরো সহজলভ্য করেছে। দেশী-বিদেশী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, নবীন শিক্ষার্থী প্রবীন শিল্পী আসছে যাচ্ছে, নির্বিচারে উপহার উপঢৌকন, শিল্পবৃত্তি বিতরিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে বৃত্তিজীবী সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনার সমকালীন প্রচারে আবেশমুগ্ধ আজকের জনমানস, তাই গুণাগুণ বিচারহীন। অজ্ঞানে সে গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছে এই সব প্রয়োজনহীন শিল্পশৈলী। স্থান, কাল, পাত্রের সঙ্গে সংযোগহীন অ-দেশজ, অ-কালজ এ সব চমকদারী শিল্প-বৈচিত্র্যে বিভ্রান্ত আজকের জনগণ যুক্তিনীতি বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে বিরত। সেদিনের সে প্রাজ্ঞ সংশ্লেষণপ্রচেষ্টা, সে ভারত শিল্পের সন্ধানমুক্তির আন্দোলন, আজ নতুন পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী নতুন বন্ধনে অবাঞ্ছিত রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কাল তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

অনিবার্য এ যুগধর্মকে যথাযথ রূপে প্রয়োগ করতে হলে অমোঘ শক্তি শিল্প ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির ব্যবহার প্রয়োজন। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মতো শিল্প ভাষা সম্বন্ধে—বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য ও দেশজ শিল্প ভাষা প্রয়োগ, প্রকরণ, ব্যাকরণ, ব্যবহার ও জনগনের গ্রহণ ক্ষমতার যথার্থতা অনুধাবন প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে নব প্রগতি অনুসরণে স্বভাবতই বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে ভাষা সমস্যা অন্যতম। এ বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে পরস্পর বিরোধী যথেষ্ট মত-অভিমতের আলোচনা ও আন্দোলন হচ্ছে। সরকার নির্দেশিত রাষ্ট্রভাষা দেশের সর্বত্র প্রচলিত

হলেও জনমানসে তার পূর্ণ স্বীকৃতি এখনও অনুপস্থিত। কিন্তু মাতৃভাষা সংরক্ষণে দেশের প্রতিটি রাজ্যই সক্রিয় ও যথেষ্ট পরিমাণে সফলকাম। আপন আপন মাতৃভাষার গৌরব রক্ষায় ভারতীয় প্রতি অঞ্চল ও প্রতিটি ভারতবাসী সর্বদাই সজাগ ও সক্রিয়। শুধু এ দেশে কেন পৃথিবীতে আজও এমন কোনো সভ্যতা বা দেশের প্রকাশ ঘটেনি যারা স্বদেশে ব্যবহৃত আপন ভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত নয়। তবু সাংস্কৃতিক জগতে কথ্য ও লেখ্য ভাষা আজও দেশজ গণ্ডিতে আবদ্ধ, তবে সংস্কৃতির উচ্চমার্গবাসী জাতির ব্যবহৃত ভাষার প্রচার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রভাবশালী। কিন্তু কথ্য ভাষার মানুষিক প্রতিক্রিয়া শ্রবণ ইন্দ্রিয়জাত। দর্শনগ্রাহ্য চিত্রভাষা থেকে স্বভাবতই দুর্বল। লেখ্য ভাষা দর্শনগ্রাহ্য বস্তু হলেও তার সংকেত যেমন শুধু মাত্র ব্যবহারকারী দেশের গণ্ডি পেরুতে পারে না তেমনি দেশজ চিত্রভাষা যুগে যুগে বারে বারে ব্যবহৃত হয়ে দেশপ্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে গণ্ডি আবদ্ধ হয়। বিদেশী শিল্প ভাষার সংকেত অপরিচিত দেশে দেশজ জনমন গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। সংস্কৃতির উচ্চমার্গ-অধিবাসী জাতির কথ্য বা লেখ্য ভাষার প্রতি বিদেশী নিম্নমার্গীদের শ্রদ্ধা থাকে তেমনি উচ্চমার্গীর চিত্রভাষায় নিম্নমার্গীর শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। এমন শ্রদ্ধাবাহিত হয়েই বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় শিল্প দিগ্বিজয় করেছিল। এমন শ্রদ্ধাতেই আমরা গ্রহণ করেছিলাম, গান্ধার, পারস্য, পাশ্চাত্যের একাডেমিক প্রভৃতি শৈলীকে। কিন্তু এসব রসিক শাসকদের দরবারেই সীমায়িত ছিল। এ সব শৈলীকে জনপ্রিয় হতে হলো সংশ্লেষণজাত ভারতীয়করণের মাধ্যমে। মথুরার শৈলীতে ও মুঘলকলায়, কালীঘাটের পটে।

আপন মাতৃভাষার প্রতি এই যে টান, এই যে প্রেম আজও আমাদের দেশে দিকে দিকে প্রকাশ পাচ্ছে, জনমনে প্রচার হচ্ছে, ঠিক তখনি, হঠাৎ চিত্র ভাষায় আমরা বিপরীতরূপে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছি কি করে? আপন আপন কথ্য ও লেখ্য ভাষার প্রচারে দেশ বিদেশের জনমনীষা যখন পঞ্চমুখ, ঠিক তখন সুকুমার কলার ব্যবহৃত ভাষা কেমন করে ও কি যুক্তিতে এমন আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠলো? আপন মাতৃভূমি ও তার ভাষার গরিমা রক্ষায় দেশে দেশে এখন যখন রক্তদান সম্ভব হচ্ছে, ঠিক তখনি শিল্প ভাষায় এমন আন্তর্জাতিক অসম প্রেমের প্রকাশ কি করে ঘটছে! একই দেশে একই সময়ে একই রসিক, একই লোক, সংস্কৃতির দুটি প্রকাশ মাধ্যমের প্রয়োগ ও ব্যবহারে এমন বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করছেন কি করে ও কোন যুক্তিতে? এই প্রশ্ন উপস্থিত করে আমি নতুন আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম।

অন্ধকারে হাত রাখো ॥ কৃষ্ণ ধর

অন্ধকারে হাত রাখো অন্ধকারে
উষ্ণতা ছড়াও করতলে
শীতল রাত্রিতে স্মৃতির খেলনাগুলি
টুকরো হয়ে ভেঙে যায় ঢেউয়ের মতন
প্রবাহিত ইতিহাসে অন্ধকার তাকে ঘেরে
করুণতা দিয়ে
অন্ধকারে হাত রাখো, অন্ধকারে
উষ্ণতা ছড়াও করতলে।

তাহার প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষমান
এই জল
নির্ঝর
পাহাড় প্রান্তর
প্রকৃতির উজ্জ্বলতা মেখে
সে এখন বিস্মিত প্রতিমা।
তাকে আমি ব্যস্ততায় খুঁজি
ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যার
পৃথিবীর ফুলে, রক্তে ও অশ্রুতে মিশে
অসামান্য রূপবতী
অসামান্য।

হাত রাখো উত্তপ্ত ললাটে
পৃথিবীর সহিষ্ণুতা নিয়ে
অস্তিত্বের অপমানে
হতাশায়
যন্ত্রণায় কম্পমান
সান্ত্বনায় স্থান দাও
অন্ধকারে বাজে তার কান্নার চরণগুলি
অন্ধকারে।

সে এই পৃথিবীকে বিস্ময়ের চোখে দেখেছিল
যদিও আমাকে সে ফিরায়েছে
চৈত্রের আগুনে
তথাপি তাকেই আমি বনস্পতি মানি
মত্ত কলরবে অস্তিত্ব হারাই যদি
ঝড়ের হাওয়ায়
সে আমাকে ডাক দেবে
আমি হারাবোনা
যেহেতু একদিন সে আমাকেই ভালোবেসেছিল।

বন্ধু, শোক ॥ সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর ছায়ায় হাওয়া খেলা করে, শান্ত, উদাসীন ;
ধূসরতা-শ্রান্ত দিনে নির্মমতা ফেরে একাকীই,
বন্ধু, শোক, প্রবঞ্চনা, শিয়রে করাল সমাসীন,
ওত পেতে আছে হত্যা, বন্ধুবেশী, নিষ্ঠুরতা এই।

তবু সূর্য ওঠে, ফুল ফোটে, বন্ধু ডাকে, হাসে, আসে
অজস্রতা, প্রেম, স্বপ্ন ; স্মৃতি খোঁজে ব্যর্থতার স্বাদ,
মৃত্যুর ছায়ায় হাওয়া হাসে একাকীই, কেন হাসে !
নির্বিচার নির্মমতা, বন্ধু, শোক, ঘোর অবসাদ।

সেই সেতু ॥ অরুণাচল বসু

অদৃশ্য সেতুটি ছিলো অন্ধকারে,
আছে কিম্বা নেই
দ্বিধাহত প্রশ্ন ছিলো এ-ই।

তারপর ঝড় উঠলো
হেঁটে গেলো প্লাবনের জল,
ভঙ্গুর আগাছা ডুবলো
বালিয়াড়ি নিলো রসাতল।

প্রচ্ছন্ন প্রকট ক্ষয়
মেনে নিলো শূন্য পরিণাম,
ভণিতার মেঘ মুছে
দেখা দিলো রৌদ্রারূঢ় নাম

এবং কয়েকটি খাল, কিছু নদী
জলা আর বিল,
এবং ভুবনজোড়া সেই সেতু
সেই মগ্ন মিল।

অদৃশ্য যোজক জাগলো :
অন্য মূল্য, ভিন্ন প্রতিশ্রুতি,
লগ্ন এক মৌনপণ
উপেক্ষিত স্মৃতির প্রস্তুতি,

স্বকৃত উদ্যোগে, সখ্যে
স্বতঃস্ফূর্ত শুভ্র সংবেদনা—
এ-উষ্ণ তৃষ্ণার উৎসে
সে-অপার বৃত্ত কি পাবো না ?

ছিলাম বিশ্লিষ্ট, নিঃস্ব
লোকায়তে, লুপ্ত, অন্তরীণ,
অদৃশ্য সেতুটি জাগলো :

ঝাঁপ দিলো সূর্যের হরিণ।

জোনাকির দীপ ॥ শেখর নাহা

বিদ্যাধরীর মজা মোহনায়
আলতাপলাশে রাত্রি নামল
শঙ্খচূড়ের মাথার মণি
জেলে দিল ভাটালো রজনীগন্ধারা।

বকুলের ঘুম ভাঙল।

পশ্চিমের জানালায় কলাবতী রোদ
এক আকাশ চোদ্দ ক্যারেট সোনা
টেমসের সেতু নন্দিত হলো
যীশুর করোনেশন, মুক্তো ছেটাল দূরের চার্চ।

খালাসীর গান জাগল।

নাগিনী অন্ধকারে এ শহর বন্দর
চটকল পাটকল নিশুতি গঙ্গা
বিনিদ্র বনকাপাসি ঘাসের বাসর
কারবালা ট্যাংক লেনে বাঘিনীর থাবা

জোনাকির দীপ জলল।

আনাগোনা ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কড়ারোদের দুপুরে
ভেষজ গন্ধে বাতাস ভরে আছে,
মাঠের পথ
খাপছাড়া, নিস্তব্ধ,
রাঙচিতা, মেহেদী আর ভেরেণ্ডার বেড়ার মাঝখানে
পিঠ-পেতে শুয়ে
ঘুমে গা আলগা করে দেয়।

দূরে বিমান বন্দরে
বিদেশী উড়োজাহাজ তারস্বরে
স্তব্ধতা খান-খান করে।

শব্দতরঙ্গগুলোর ধাক্কায়
ক্রমে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয়-ধোয়া পল্লীর
দামী দুর্বোধ্য তেলরঙা ছবি
একটু দুলিয়ে দেয়, আমি দেখি
রঙ আর তুলির রেখায়,
মানুষেরা আসে আর যায়।

কল্যাণী ॥ সাবিত্রী রায়

নীলকণ্ঠ বিষে নীল তোমার চোখের পদ্মায়
মন্থনে ফেনিল শুধু বিষ-ঢেউ। আমার আত্মায়
রক্তাক্ত মৈত্রেয়ী আর্তি, প্রার্থনা, নোয়ার আর্তনাদ
আমার চুম্বনে তাই পাওনি তো শোনিতের স্বাদ।
প্রাগৈতিহাসিক বন ছায়ার ধর্ষণে পৌর্ণমাসী
কফিনে শ্বাপদী স্বাদ অন্বেষায় ঘৃণার প্রয়াসী।
তবুও, তবুও, ক্রুশ নিথর এ সমর প্রাঙ্গনে
সমাপ্তি তুষার গলে, একটি পাখীর গান শোনে ॥

হুজুরের বখেদমতে ॥ আব্দুর রহমান

বন্দেগী উজির সাহাব
গোস্তাখী মাফ কিজিয়ে
পেট কী আন্দার তন্দুর গনগন
যদি বলেন খুলি খাল
ডুগডুগি ঢোল বানিয়ে তোফা
তসলিম দিই জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ
জমি জিরাত সার্টিফিকেট
ট্যাক্সোবাজির ধুন্ধুমার
বৌ আনতে বৌ ছাড়তে
বাপ হতে কবরে শুতে
রসিদ কাটো ট্যাক্সো দাও কাহ্নন বাঁচাও
লোনা পানির ময়লাবে ফের
জরু গরু মিশমার।
খেদমত হয় নি হুজুরে কেবলার
গত সফরে
হাওয়াই কলের পাই নি লাগ।
গলা ইস্তক পানি বিলকুল
আঁখ ফুটো সানকি ফুটো
লোনা আঁসু ধরবো কিসে
কী দিয়ে বা ধুয়ে দেবো
হুজুরে আলার কদম মুবারক
এতনা তক্‌লীফ নিলেন জনাব
খেদমত করবো মেজাজ গোসা
আর্জি শুনুন উজীর সাহাব
জান পেরেশান হয়রান হয়ে
ফায়দা নেই ফিরে যান।
থোড়া সবুর একটু রহুন
পাক কদম মুবারক জী
চোট মুসিবত সইবে না।
শুখা পাঁজরার হাজার হাড়ে
পাল্কি বানাই চড়ে যান।

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

যে চায়ের দোকানে সুব্রতর অপেক্ষা করার কথা তার নাম স্বদেশী কেবিন। জাতীয় আন্দোলনের স্বদেশী যুগে রেস্তোরাঁটার জন্ম। এর মালিক বদল হয়েছে বার দুয়েক। এখন যিনি মালিক তাঁর নাম বিশুবাবু, বিশুদা বলে ডাকে এ অঞ্চলে ওদের পার্টির সবাই। আগে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। এখন একটা বোন বিধবা হয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ায় আর সর্বক্ষণ নিয়োগ করতে পারেন না। তবু রেস্তোরাঁটা চালাতে চালাতে যতটা সম্ভব সাহায্য করেন। বিশুদার মুখময় বসন্তর দাগ। দোহারা চেহারা। খাঁকি হাফসার্টের ভেতর দিয়ে একটা মাদুলি নজরে পড়ে। অম্লশূলের অসুখ আছে। তারই মাদুলি। সুব্রতকে দেখে বিশুদার মুখে বিশেষ বিকার দেখা গেল না। কাউন্টারের ক্যাশবাক্সের ডালা খুলে খদ্দেরকে খুচরো পয়সা ফেরত দিতে লাগল। খদ্দের দুজন নেমে গেলে বিশুদা একবার দোকানের পেছনে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে কারিগরদের কি যেন বকাবকি করল। সুব্রত একা একা ফাঁকা রেস্তোরাঁটায় চুপ করে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে লাগল। স্টেশনের দেওয়ালে কবেকার পুরনো কালি মুছে যাওয়া অস্পষ্ট পোস্টার—ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়। আদ্ধেকটা পোষ্টার আটা ধুয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে। হাতের লেখাটা সুব্রত চিনতে পারল। বিশুদাকে জিজ্ঞাসা করল—

—হাতের লেখাটা হেমন্তর না?

—না, ওর ছোট ভাই তুষারের। প্রায় একই রকম হাতের লেখা।

—তুষারকে তো চিনি আমি। ও কাজকর্ম করছে বুঝি?

—হেমন্ত ইউ জি-তে যাবার পরেই ওকে এ্যাকটিভাইজড করা হয়েছে, না হলে ওদের সেলের পক্ষে আর ফাংশন করা সম্ভব হতো না।

—স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল না?

—দেবার কথা ছিল, দেয়নি।

চুপ করে রইল সুব্রত। তুষারের খবর তাকে খুব স্পর্শ করেছে বলে বিশুদার মনে হলো না। ইংরাজি খবরের কাগজটার তৃতীয় পাতায় চোখ বুলোতে লাগল। দি নেশন। শরৎবাবুর কাগজ। বিশুদা আস্তে আস্তে কথা বলে চললেন।—ছেলেটা খুব মিলিট্যান্ট। তবে যা হয় লড়াকু হলেই একটু মাথা গরম তো হবেই, তার ওপর বয়সটা একেবারেই কাঁচা। পরশুদিন মিল গেটে গেট মিটিং করতে গিয়েছিল, চন্দ্রিকা সিংয়ের লোকেরা হাঙ্গামা করেছে। বলেছে দিল্লিতে কংগ্রেসের রাজ হয়েছে বলে বাঙালীবাবু লোকের মেজাজ খারাপ হো গয়া, তাই শালা বাবুলোক পুকার তুলছে ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়। সুব্রত চুপ করেই শুনে যেতে লাগল। জানে, সে সবই জানে। ক্যাডারদের ধারণা হচ্ছে ক্রমশ, যে অবাঙালী শ্রমিকমাত্রেই মালিকের দালাল। উল্টোদিকে রিফ্যুজিমাত্রেই মিলিট্যান্ট। অথচ রিফ্যুজিদের মনোভাবকেও রাজনীতিক মনোভাব বলে সে ভাবতে পারে না। তাদের মনোভাব কতকটা এই যে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে এখন বলছ মাছে কম, মিষ্টিতে কম। চন্দ্রিকাসিংয়ের কথা আর এই কথার মধ্যে সুব্রত কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পায় না।

বিশুদা বলে যেতে লাগলো—তুষারের ওপরই হামলাটা বেশি হয়েছে। নাকে আর মাথায় চোট লেগেছিল। আমি গিয়েছিলাম দেখা করতে। খুব ভেঙে পড়েছে। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বিশুদা বলল—না মার খেয়ে ভেঙে পড়েনি। পার্টি অর্গানে ব্যাপারটার রিপোর্ট বেরিয়েছে। খুব রঙ-চড়ানো একটা জঙ্গী রিপোর্ট। তুষার বলছে যে এর একাংশও সত্য নয়। মোটেই পিপ্‌ল তাকে মদত দেয়নি। যে কাবলীওয়ালাটা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে তাদের কাছে টাকা পায়, এইমাত্র। তুষার কেঁদে ফেলল, বলল, জানেন বিশুদা পার্টি-অর্গানের প্রতিটি অক্ষর আমি বেদবাক্য মনে করতাম। সে বিশ্বাস আমার ভেঙে গেল। ও বসে পড়লে নয়নপুর সেলে দুটো মেয়ে ছাড়া আর কেউ রইল না।

সুব্রত বিমর্ষ খবরের কাগজের পাতায় মন দিল। চারের পাতায় যাবার আগেই আবার চোখ তুলে তাকাল। স্টেশন ধোয়া মোছা হচ্ছে। দেওয়ালে জল দিয়ে অনেকদিনের বাসি পোস্টারগুলো ওরা তুলে ফেলেছে। বিশুদা বলল—আজ বুঝি জি. এম-এর ইন্সপেকশন হবে। সেই বিবর্ণ

পোস্টারটা জলে চুপসে মাটিতে পড়ল। তারপরে আবর্জনার বড় ঝুড়িটায় ঠাঁই পেল।

বেলা গড়িয়ে চলেছে।

স্টেশনের সামনে রিকসা স্ট্যাণ্ড এখন একটু ফাঁকা। আপ ডাউন ছুটো ট্রেন এসেছিল এইমাত্র। অনেক সোয়ারি নেমেছিল। অনেক রিকসাই সোয়ারি নিয়ে চলে গেছে। রাস্তাটা হালকা। অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, কল কারখানা আজ ছুটি। শীতের হাওয়া বইছে। হুয়ে পড়া নিমডাল থেকে নিমপাতা ঝরছে। স্টেশন বিল্ডিঙের লাল ইঁটের দেওয়ালটা সুব্রতর কাছে বড় স্যাঁতসেঁতে বলে মনে হলো। অন্যদিন হলে কলেজের ছেলে মেয়েদের ভীড়ে বোঝাই হয়ে যেত এখানটা; আজ কেমন ভাল লাগছে।

বিশুদা বলল—সুব্রত। তোমার সঙ্গে কার দেখা করার কথা?

—তাতো জানি না। এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

—রান্নাঘরের পেছনে চলে যাও, মানব এসেছে, ওরই বোধহয় আসার কথা।

মানবকে সুব্রত চেনে। ওই তাহলে শেখর। মানব ওর জন্যে অপেক্ষা করছে শুনে সুব্রত বিশেষ খুশি হতে পারল না। মানবকে ইউনিভার্সিটি থেকেই ওরা সবাই কমরেড অবজেকটিভ বলে ডাকে। অতি সামান্য কথাও তত্ত্বের ফোড়ন না দিয়ে সে বলতে পারে না। রান্নাঘরের পেছনটা তাদের হোটেলের পায়খানারও পিছন দিক বটে। একটা তেলচিটে বেঞ্চি বার করে ওরা বসল। মানব গোঁফ রেখেছে। মাথায় টুপি। টুপি দেখে সুব্রত পাছে হাসে তাই মানব তাড়াতাড়ি বলল, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ কিছু হয় নি। খুব গম্ভীরভাবে মানব ওকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল। পার্টি সার্কুলার। পার্টি জানাচ্ছে বিভিন্ন ব্রাঞ্চকে যে কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সদস্যপদ বাতিল করা হলো। এক, দুই, তিন করে তার ডিভিয়েশন, তাত্ত্বিক বিচ্যুতি, তা থেকে যে সব কর্তব্যে গাফিলতি হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুব্রত চৌধুরী পার্টির পুরনো বন্ধু বলে তাকে পুনরায় নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করে সদস্যপদ পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেওয়া হবে।

—পার্টি মনে করে যে আপনি আত্মকেন্দ্রিক ভাবে চিন্তা না করলে কাগজপত্রগুলো পুলিশের হাতে যেত না, এবং কমরেড সুরজিৎকেও হয়তো এক্সপোজড হতে হতো না। মানব খুব গম্ভীরভাবে কথাটা বলল।

—আমি কোনো রকম ভাবেই চিন্তা করতে পারছি না।

—অবজেকটিভ সিচুয়েশন থেকে লেস্‌ন্‌ নিতে না পারলে আমরা মার্কসিস্ট কিসের?

—তুষারের খবর জানো?

—দালালদের কাছে মার খেয়েছে।

—এক রাস্তা বোঝাই লোক, এক মিল বোঝাই ওয়ার্কার্স সব দালাল?

—আপনি সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়েন নি।

—কী সে ইতিহাস?

—অবজেকটিভ কণ্ডিশন সব সময় সমান যায় না।

—মানব, তুমি কী বোঝো জানি না; তবে তোমার একটু আগের কথাটা আমি মানি, বাস্তব অবস্থা থেকেই মার্কসবাদীদের শিক্ষা নিতে হবে।

একজ্যাক্‌ট্‌লি। আপনি যদি নয়নপুর ক্যাম্পে যান দেখবেন যে সারা তল্লাট টগবগ করে ফুটছে, এ্যাকশন চায় তারা।

—কিন্তু ক্যাম্পডোল বেশি পেলে তারাই আবার রি-এ্যাকশনারি হয়ে যাবে না তো?

—কমরেড আপনি তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপের কমরেডদের পার্টির সদস্যের মতো কথা বলছেন না।

—তুমি তুষারের সঙ্গে একবার দেখা কর।

—আপনারা রেভোলিউশনের আর কোনো কাজে লাগবেন না, এখন দেখুন যদি সিঙ্গুর কি বাগনানের কৃষক কমরেডদের জন্য ভাতরাঁধার গৌরব অর্জন করতে পারেন। মিডল ক্লাশে পার্টির বেস্‌ হলে এই হয়। যখন ফর দি কজ্‌ সেলফ্‌ স্যাক্রিফাইসের প্রশ্ন তখন·····

—আজকের নেশন দেখেছ?

—আমার কিচ্ছু দেখার দরকার নেই, আমি যে কোনো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে রাজি আছি। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু ওয়েট ফর ডে ব্রেক টু বিলিভ ইন লাইট।

কথাটা গ্যাব্রিয়েল পেরির। মানবের প্রিয় বয়েতগুলির একটা। মানব বিরক্ত মুখে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর একখানা চিঠি দিল সুব্রতকে। ওকে জানানো হচ্ছে যে ওদের সেল লিকুইডেট করে দেওয়া হলো। এবং ওকে আগামী চোদ্দই ডিসেম্বর ডি, সির সামনে হাজির হতে বলা হচ্ছে।

ও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ পাবে। মানব জুতোর বেল্ট লাগাতে লাগল, বিড়িটা দাঁতে চেপে।

স্নান না করলে সুব্রতর শরীর খারাপ লাগে। অস্নাত ও অভুক্ত সুব্রত নৈহাটী স্টেশনেই ফিরে গেল। বিশুদা কখন বাড়ি চলে গেছে। কোথায় যাবে সে স্থির করতে পারছিল না। এখন বোধ হয় কোনো ট্রেন নেই। স্টেশনটা ঝিমন্ত। লাল পাঞ্জাবি পরা কুলিগুলো খইনি ডলছে অথবা অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ওভার ব্রিজের ওপর উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। বাড়ি ফিরে গেলে হয়। অথবা নতুন কোথাও একটা সেন্টার নেওয়া যায়। বাড়ি গেলে প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী হয়তো নানান অসুবিধার মধ্যে পড়বে। মুখে কিছু অবশ্যই বলবে না। কিন্তু কোন্ সরকারী চাকুরে পুলিশে খোঁজা আত্মীয়কে হাসিমুখে ঘরে তোলে! সুব্রত যদি বেশি বেশি ওবাড়িতে যাতায়াত করে বা থাকে তাহলে বিচিত্র নয় প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী কলকাতায় বাসা করে চলে যাবার কথা ভাববে। মা না থাকলে প্রিয়ব্রতর এ সিদ্ধান্তে কিছু আসতো যেত না। কিন্তু মা বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যাবেন না। এবং প্রিয়ব্রতরাও মাকে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হবে কিনা সুব্রতর এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ সুব্রত নিজেও তো মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবে না। অতএব ওপথে না যাওয়াই ভাল। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে কখন যে পূবদিকে নেমে পড়েছে সুব্রত, হাঁটতে শুরু করেছে তা বোধহয় সে নিজেই জানে না। হাঁটতে হাঁটতে সে বঙ্কিম চাটুয্যের বাড়ির কাছে এসে পড়ল। পুরনো আমলের বাড়ি। বঙ্কিমবাবুর বাইরের ঘরখানার সামনে সে একবার দাঁড়াল। ভাঙ্গা, আগাছা-জন্মানো পোড়ো ভিটে। পাশের মন্দিরটা তবু আস্ত আছে। ঘরের গায়ে ছোটবেলা থেকে দেখে আসা মার্বেল ফলক। চিরকালই সমান ময়লা। ফলকটা ছোটবেলায় যখন প্রথম দেখেছিল শিউরে উঠেছিল সুব্রত— "এই ঘরে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।"

উদ্দেশ্যহীন। মন্থর। অসংলগ্ন পদচিহ্ন। জিভ যেন কাগজের টুকরো। সুব্রত হাঁটতে হাঁটতে আবার স্টেশনের দিকেই পা বাড়াল। আর একটা রাস্তা আছে। কোর্টে গিয়ে সারেণ্ডার করা। স্টেশনে আবার একটু একটু করে ভীড় জমছে। দুপুর বিকেলের দিকে ঢলছে। হয়তো গাড়ি আসবে এখুনি। চঞ্চল হয়ে উঠেছে স্টেশনের বাতাস। হাতের মুঠিটা যেন জোর

করে বন্ধ করতে হচ্ছে। ওর ধারণা ছিল কোথাও একটা ওর সেন্টারের ব্যবস্থা হবে। হলো না। পকেটে একটা পয়সা নেই। আবার বিশুদার কাছে যাবে—তার চেয়ে থানায় যাওয়াই ভালো।

কিসের একটা গোলমাল উঠল এক নম্বর প্লাটফর্মে। চেঁচামেচি। পুলিশের লালপাগড়ি। সুব্রত থমকে দাঁড়াল। ভীড়টা গোল হয়ে রয়েছে। আপনাদের মা বুন নাই। ছুটো আধশুকনো যুবক বলল, শাঁখ বাজা, জোকার দে, ওরে বিব সেই মাগিটা ইষ্টিশনেই বিইয়েছে। পুলিশ ভীড় সরাবার চেষ্টা করছে। কেউ হাসছে। কেউ গালাগাল করছে। কেউ খবরের কাগজে দেবে বলে খোঁজ খবর করছে। 'মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে'। আর সব গোলমাল ভেদ করে খনখনে গলায় এক বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—মাহিন্দির অ মাহিন্দির তর একটা পোলা হইছে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বি. টি. রোডের ওপর দিয়ে প্রিজন ভ্যান ছুটে চলেছে। বাঁ পাশে সোদপুরকে ফেলে, পানিহাটির কাপড় কল এলাকার মাঝখান দিয়ে গাড়িটা ছুটছে। গাড়িতে ওপাশের বেঞ্চে আরো দুজন কয়েদি। ওদের একজন ধর্ষণকারী। আর একজন চোর। গাড়ির পিছনের দরজায় গাড়োয়ালি পাহারা। সঙিনের খাপ খোলা। ছোট খুপরির ফাঁক দিয়ে সুব্রত দেখল লিন-বেরি মিলগেটের লক আউট। খাটিয়া পেতে পুলিশ বসে আছে। দুপুরের বি. টি রোড। জনস্রোতে ভাঁটা। শুধু মাল-বোঝাই লরিগুলো ধুলো ওড়াচ্ছে। ভেঁপু বাজাচ্ছে সাইকেল রিকসা। সুব্রত ঠাণ্ডা গরাদটায় কপাল চেপে ধরল। ওর প্রতিরোধ সত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাসকে মুক্তি দিতে হলো। আপাতত নিশ্চিন্ত। ও সারেণ্ডার করছে শুনে কোর্ট ইন্সপেকটার চমকে উঠেছিলেন। তাড়াতাড়ি করে চেয়ার আনিয়ে, চায়ের হুকুম করে নার্ভাস ভদ্রলোক এক কাণ্ডই বাধিয়েছিলেন। তখন বেলা দশটা। এখন দুটো। দমদম সেণ্ট্রাল জেলে যাচ্ছে ওরা। সাব ডিভিশনাল অফিসারের মিহি আভিজাতিক গলা এখনো

কানে যাজছে—কোনো স্টেটমেন্ট দেবেন ?—না।—আপনার তাতে সুবিধে হতে পারত।—থ্যাঙ্কস্।

ধর্ষণকারীর বোধহয় অনুশোচনা হয়েছে। চোর যে সে সিপাইজির কাছ থেকে একটা দেশলাই কাঠি চেয়ে নিয়ে দাঁত খুঁটতে শুরু করল। সুব্রতর দিকে একবার এবং ধর্ষণকারীর দিকে আর একবার তাকিয়ে পরম আয়েসে বেঞ্চির ওপরে পা দুটো তুলে দিল সে। তারপর সুব্রতকেই জিজ্ঞাসা করা সমীচীন ভেবে সে জিজ্ঞাসা করল—কটা বাজে বলতে পারেন স্যার ?

—গোটা তিনেক হবে।

—স্যার কি হাজতী, না মেয়াদী ?

—চুপরও বুড়বক। পাহারা ধমক দিল। তারপর বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর চোর বলল—ছোড়ো বাত রাজা, গরীব আদমির কাছে সব সমান। লাল, তেরঙা কই হরজা নেই।

—ইস্‌পেশাল খাওয়া পাবেন আপনি। সুব্রতকে একটু যেন আশ্বস্ত করতে চাইল সে। সুব্রত তবু উৎসাহিত হলো না দেখে চোর পা নামিয়ে বসল। সম্ভবত ধর্ষণকারীর সঙ্গে একটু দূরত্ব রচনা করলে সুব্রত আকৃষ্ট হতে পারে এই ভেবে একটু কাছ ঘেঁষে এল সে। অগত্যা সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—তোমার কী কেস ?

—পেটি কেস। যেন ওটা কোনো কেসই নয় সুব্রত ভাবল।

—ওর কী ?

—বলবেন না। যত নোংরা ব্যাপার শালা। আবার বলে কিনা লভ হয়েছিল। মেয়েটা ফাঁসিয়ে দিলে। ইষ্টিশনে থাকে—রিফ্যুজি।

সুব্রত চুপ করে রইল। চোর খানিক বাদে আবার শুরু করল—দু তরপা বিচুলি সরাতে গিয়ে গেঁথে গেলাম। স্যার। প্রমদাবাবুর গোলায়। মিনসিপ্যালিটির ভোটে দাঁড়াতে পারেনি প্রমদাবাবু। দিল্ বিগড়ে ছিল। চালান করে দিল। হাকিম একমাস ঠুকে দিয়েছে।

ধর্ষণকারী এতক্ষণে কথা বলল— লাল দালান তো তোর ঘর বসত রে।

—আবে তুই চুপ যা।

—কিসের চুপ যা, তুই স্মাগলার না, এর আগে লাল দালানে যাস নি ?

—সে তো ডবলিউ টির জন্যেরে শালা, তোর মতন—

—আমি তোর মতন চোট্টা নই। মরদ, হিম্মৎ আছে—

—চোট্টা নস্ ? তোর নিজের জিনিস ছিল ওটা শালা ? মারে—

এ্যাই বুদ্ধু—পাহারা আবার ধমকাল। চোর এবং ধর্ষণকারী দুজনে চুপ করে যাবার পর সুব্রতর মনে হতে লাগল দুজনেই একরকম দেখতে। লম্বা থুতনি আর মোটা ঠোঁট কেবল বাইরের ব্যাপার। দমদমের রেলওয়ে কালভার্টের তলা দিয়ে প্রিজন ভ্যান যশোর রোডের দিকে এগুলো। চোর কোথা থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা বাড়িয়ে ধরল সিপাইজীর দিকে। পাহারা একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর গম্ভীর ভাবে বিড়িটা মুখে গুঁজল। একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে চোর তাকাল ধর্ষণকারীর দিকে। সিপাইজীর পায়ের কাছে পড়েছিল হাতকড়া আর দড়িগাছা।

এখুনি চোর ধর্ষণকারীর দিকে আধখাওয়া বিড়িটা এগিয়ে দেবে। সুব্রত ভাবল। ওদের মতান্তর বোধহয় গভীর নয়। মনান্তরের প্রশ্ন নেই। ধর্ষণকারীও চোর। চোরও ধর্ষণকারী। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়িটা। ওরা গল্প করছে। সিপাইটাও। সিপাইটার কাছে সুব্রতই অনাত্মীয়। সে রকম সাংবাদিক থাকলে ছবি তুলে নিতে পারত। এদেশের ধর্ষণকারী, চোর এবং পুলিশ কেমন দেশদ্রোহীকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এই ক্যাপসন চমৎকার মানাত। চোর তার মায়ের গল্প করছে। হাড় গুড়গুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে, ওটাকে নিয়েই ঝামেলা। ধর্ষণকারী তার মত প্রকাশ করল—মেয়েমানুষ সব সময়ে ঝামেলা। তারপর সিপাইজী কী একটা মস্করা করতে ওরা দুজনে হেসে উঠল। বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল সুব্রত। গরাদের লোহা মায়ের হাতের মতো ঠাণ্ডা। সেই হাড় গুড়গুড়ি বুড়িটার হাঁপানি, ঘোলাটে কাসি সুব্রতর বুকটাকে টনটনিয়ে দিল। রাতভোর সে ঘুমোবে না। সাতান্ন আটান্ন উনষাট—প্রিয়ব্রত গুণবে না, ঘুমিয়ে থাকবে।—যাক বুড়িটা মেয়ের বাড়ি চলে যাবে। সোদপুরে। সুখ নেই সেখানেও। বোনকে সোয়ামি নেয় না। তবু মরে গড়িয়ে যাবে না। চোর বলছিল।

বিকেল হয়ে আসছে। কত মানুষ রাস্তায়। বাড়ি ফিরছে। বাড়ি থেকে আসছে। আর গারদ গাড়ির ভেতরে চোর ধর্ষণকারী সিপাইয়ের হাসি। সুব্রতর গা ঘিনঘিনিয়ে উঠল। ঘর ফিরতি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সুব্রতর মনটাও বাড়ির জন্য আকুল হলো। সে যে ঘরে ফেরার জন্য, মায়ের জন্য এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে একথা গত একবছরে তার একবারও ভাবার

অবকাশ হয় নি। গত একবছর এমনধারা ভবিষ্যৎশূন্য হয়ে বসার অবকাশও তার হয় নি। এবং এই মুহূর্তটাকেই, সে দেখল, এখনো সে আগের মতোই ভয় করে। এই হিম-হিম শীত ছুঁই-ছুঁই বিকেলে যে কথাকে সে সবথেকে বেশি এড়াতে চায় সে কথাটাই তাকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল। সে কি নিরর্থকের পিছু পিছু ছুটছে! মনে পড়ল রমেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় বসে বসে ওরা দুজনেও কখন অজানতে এই কথারই সুঁড়ি পথ ধরে অতল খাদের কিনারার কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল। শ্যামল পার্টি ছেড়ে দিয়ে একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছে। সে কথার সূত্রেই রমেন বলছিল—মনে আছে শ্যামলদাই আমাদের ডায়ালেটিকস পড়িয়েছিল? সুব্রত ঘাড় নেড়েছিল। নাইনথ মার্চের রাত্রেও চিৎপুর ইয়ার্ডে গ্রুপ মিটিং করেছে শ্যামলদা।

—কী হলো শ্যামলদার? সুবিধাবাদী হয়ে গেল? রমেন জিজ্ঞাসা করেছিল।

—আমি এই বস্তাপচা সরলীকরণে বিশ্বাস করি না রমেন।

—পার্টি লেটার তো তাই বলে।

এর জবাবে যে কথাটা বলতে চেয়েছিল, সে কথাটা সুব্রতর বলা হয় নি। একথা আর রমেনকে কোনোদিন বলাও যাবে না যে মার্কসবাদ সালসা নয়। ক্যাডার ডিসাইডস্ এভরিথিং। শ্যামলদার সবটাই নয়। পার্টিকে নতুন করে ভেঙে গড়তে হবে। থিওরেটিসিয়ান শ্যামল দস্তিদার সে কথা থিওরিতে বুঝেছিল সবার আগে। কিন্তু ওয়ার্কিং ক্লাস লিডারশিপ বানাতে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খেল শ্যামলদা নিজেই। মঙ্গল আর সুখলাল টার্ণার আর কেবিন খালাসি হতে পারে, সাহসীও বটে, কিন্তু আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। শ্যামলদার কাছ থেকে সেক্রেটারি পদ কেড়ে নিয়ে দেওয়া হলো ওদের। শ্যামলদা হলো আটপৌরে ক্যাডার। রিভিশনিস্ট শ্যামলদা শেষটা পালিয়ে বাঁচল। রিভিশনিস্ট—ইনফ্যান্টাইল ডিস্অর্ডার—

—কড়াৎ করে একটা শব্দ। চোর আর ধর্ষণকারীকে এক হাতকড়ায় বাঁধা হলো। রেপ। রেপ অফ দি লক। রেপ অফ অষ্ট্রিয়া। হিটলারের বোঁচা গোঁফ। চোরদের থেকে ধর্ষণকারীরা খারাপ। টাক মাথা মোটা চুরুটের চেয়ে, খর্বকায় বোঁচা গোঁফ। কিন্তু কতদূর খারাপ? মাত্রাগত না গুণগত তফাৎ? চোর আর ধর্ষণকারী কতক্ষণ আলাদা থাকে?—ঢং-ঢং,

ঢং-ঢং দমদম সেণ্ট্রাল জেলের গোল গম্বুজে চারটে বাজল। ধর্ষণকারীকে চোর তখন সোদপুরে গান্ধি মহারাজ আসার গল্প বলছিল।

'দূরশব্দ শ্রবণকক্ষ'—এই ঘরখানার নাম। দেশের স্বাধীনতার অব্যর্থ প্রমাণ হয়ে টেলিফোন রুমের নামান্তর। এক মোটামতো বিধবা মহিলা জেলের কর্মচারীকে কাকুতি মিনতি করছিলেন। 'জেলে ওসব নিয়ম নেই'। 'তুমি আমায় জেল চিনিও না বাবা, বাইশ সাল থেকে কত্তা জেলে আসা শুরু করেন, এই পেটের শত্তুরটা বিয়াল্লিশ সাল থেকে। 'তখনও মিষ্টির হাঁড়ি দেওয়া চলতো না। এখন কংগ্রেস গর্মেণ্ট'—ভদ্রমহিলা নাছোড়।—'তুমি থামো তো বাবা, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট সবাইকে জন্ম দিলাম, আর তুমি আমায় দল চেনাচ্ছ।' এক প্রান্তে একটা ঘরে, লম্বা টেবিলটার সামনে সুব্রত দাঁড়াল। দূরে চোর আর ধর্ষণকারী মাটিতে উবু হয়ে বসে ফাইল দিয়েছে।

—কোথায় যেতে চান?

—'.........'

—সি. পি. আই ব্লক না আর. সি. পি. আই ব্লক?

—সি. পি. আই ব্লক। যন্ত্রের মতো সুব্রত জবাব দিল। ফ্যাকাসে রঙের জুট ফ্লানেলের সার্ট পরা সেই প্রৌঢ় একটিপ নস্য নিয়ে বললেন—চলে যান, ডেটিন্যু করেছে আপনাকে। তিন ছটাক করে মাছ, দু দিন মাংস, একদিন ডিম। এ্যালাওয়েন্স। তার ওপর যদি মেডিক্যাল ডায়েট···জিভ চানকে থামলেন।

অনেকগুলো বড় গেট পেরিয়ে, অনেকগুলো গোলোকধাঁধার শেষে ডেটিন্যু ওয়ার্ডের বি ব্লকে যখন সুব্রত পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা ঘোর ঘোর। পুজোর ঘণ্টার মতো একটা হাতঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে একজন ওয়ার্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আধঘণ্টা সময় আছে বাইরে থাকার। আর আধঘণ্টা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের বছর-শেষের দমদম সেণ্ট্রাল জেল। ডেটিন্যু ব্লক, আণ্ডার ট্রায়াল ব্লক তখন বোঝাই। সুব্রত অবাক হয়ে সেই আবদ্ধ জনমণ্ডলীর মধ্যে মিশে গেল। বাংলাদেশের এতগুলো পরিবারে এতগুলো শয্যা শূন্য!—সুব্রতর হাত ধরে টানল একজন পাৎলুন-পরা যুবক।

—সুব্রত।

—নৃপেন।

—এখন এলি। আয়। কেদার। চোদ্দ নম্বর ঘরে। আজ দিনটা ভাল রে। মা এসেছিল। জেল গেটে ঝগড়া করে জন্মদিন বলে মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে গেল। এই ফিরে আসছি গেট থেকে তারপরেই তুই।

—উনি তোর মা? গেটে খুব ঝগড়া করছিলেন। আমি অবশ্য ফরটি সিক্সে সেই একবারই দেখেছি। কিন্তু চিনতেই পারিনি আজ। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা—

—বাবা মারা গেলেন। পাল্টে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। কেদার—জোরে হাঁক দিল নৃপেন।

লম্বা, রোগা, কোমরে বেল্ট বাঁধা মেট এগিয়ে এল। পিছু পিছু গোটা দুয়েক বিড়াল ছানা। কোলকুঁজো লোকটা নেশাগ্রস্তের মতো লালচে চোখ দুটো জোর করে মেলে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—আমার বেডের পাশে বাবুর ব্যবস্থা করে দাও।

খানিকক্ষণের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেকেই যারা ওকে ভালবাসত খুসি হলো। নেতারা একটু চাপা চাপা রইলেন। ওযে দলের সদস্যপদ হারিয়েছে এটা এখানে অজানা নয়। জেল কমিটি ওকে পরে দেখা করতে বলল। এবং নিষেধ করে দিল ওকে যেন এর মধ্যে বাইরের কোনো খবর সাধারণ সদস্যদের কাছে না বলে।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে, বড়ো হল ঘরটায় সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ল, নৃপেন আর ও গল্প করতে লাগল মৃদু স্বরে। নিত্যগোপালদার সঙ্গে আলাপ হলো? স্থব্রত বলল—'না'। নৃপেন বলল—ভারি ইন্টেরেষ্টিং লোক। কাল হবে। আণ্ডার ট্রায়াল ব্লকে আছেন। রুখু চুলগুলোর ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতে স্থব্রত বলল—

—তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস নৃপেন।

—হাঙ্গার ষ্ট্রাইক গেল। আগের বার করিনি, হাসপাতালেই ছিলাম। এবারে করলাম। একান্ন দিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক। প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—আগের বার দিন দশেকেই চুকে গিয়েছিল।

—আগের বার রক্ত ঢালা হয়েছিল কতো। যেখানটায় তোর সঙ্গে দেখা হলো, ঐ সিঁড়ির মুখেই তো সমীরের লাস পড়েছিল। কী রক্ত রে! এখনো যেন মনে হয় খুঁজলে সমীরের রক্তের দাগ ওখানে পাওয়া যাবে। উঠোনে তুঁত গাছটার তলায় ছিল বিনয়। বাগনানের কেষ্টদা মাটি দিয়ে

প্রদীপ গড়ে কতদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির মুখে আর তুঁত গাছতলায় জেলে দিয়েছে। তারপর সবই যেমন সয়ে যায় তেমন এও সয়ে গেল। আর সয়ে গেলেই বুঝতে হবে ভুলে যাবার কাজটাও শুরু হয়েছে।

—তুই হাঁসপাতালে ছিলি কেন?

—ছিলাম কোথায়, গেলাম তো, ঐ রাতেই। এই ত্যাখ। মশারির ভেতর থেকে হাতটা বার করে দিল নৃপেন। পাঞ্জাবী পরা ছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি স্থব্রত। বাঁ হাতের প্রকাণ্ড দাগটা স্থব্রত দেখল।—তোর খবর বল্

—কী বলব বল।

—হ্যারে রমেনের খবর কী রে।

—তুই জানিস না?

—না।

—রমেন নেই। পুলিশ হাসপাতালে মরেছে।

তারপরেই ওরা দুজনেই চুপ করে গেল। বাইরে পাহারার ভারি বুটের শব্দ বাজতে লাগল খট্ খট্ খট্।

এমনিই সময় কোথায় পায়ে পায়ে চলেছে টিক টিক টিক। ঘরের মধ্যে তেইশ-জনা ঘুমন্তের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসেও সময় ঢেউ তুলছে। স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল চেতনা। বাইরে হাওয়ার শির শির। এগারহ নম্ব-অ-র, তেরহ নম-ব-র—হাড়-গুড়গুড়ি বুড়ি মা আমার। খট্ খট্ খট্ কখন যেন খক্ খক্ খক্। রুচিদের বাড়ি শেষ রাত্রে, বাড়ির বাইরে কে কাসছে? জড়িয়ে যেতে লাগল সব। রুচির দেওয়া পুলোভারটার রঙ নেভি ব্লু। ফিরে গিয়ে রুচির সঙ্গে দেখা করব। রুচির ভৎর্সনা রূঢ় চোখ—কেন মিথ্যে বললেন। রুচির বুক ফুলে উঠছিল। হৃদয়-সমুদ্র, কী রঙ তার। হঠাৎ সবকিছু মুছে গেল। বিমর্ষ পদক্ষেপ, খুট খুট খুট—উঁচু গোড়ালি নার্স। লাল কম্বলে ঢাকা রমেনের মুখ। কী ফ্যাকাসে। কী বিবর্ণ। কী শুকনো অথচ এত লাল ব্যাণ্ডেজ। 'কী রক্ত রে'। ঘুমের কালো নদীটা আস্তে আস্তে স্থব্রতকে গ্রাস করে ফেলল। তবু তার মধ্যেও সে দেখতে পেল, সেই নদীর ওপার থেকে বুকের ব্যাণ্ডেজটা চেপে ধরে, রমেন যেন কী বলছে। রমেন আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু না। পাশ ফিরে শুল স্থব্রত—কী হবে শুনে। সয়ে যাবে। গলার কাছটা টন টন করে উঠল। সয়ে যাওয়া মানেই ভুলে যাওয়া।

সেদিন দুপুরে নৃপেন, নিত্যগোপালবাবু আর সুব্রত গল্প করছিল। শীতটা কদিন হলো গায়ে লাগছে বেশ। দমদম জেলের বিচারাধীন বন্দীদের ওয়ার্ডের একটা ঘরে বসে বসে ওরা কথা বলছিল। নিত্যগোপালবাবু খুনের মামলার আসামী। মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামের ছেলে তিনি। চাষী এবং জোতদারের জমির লড়াইয়ের ভেতর থেকে জেলে এসেছেন। এক ভয়াবহ কৃষক-জোতদার সংঘর্ষে নিহত হন জোতদার নন্দগোপালবাবু, নিত্যগোপাল-বাবুর দাদা। পুলিশ গ্রেফতার করেছে নিত্যগোপালবাবুকে, এবং আরো একান্নজনকে। একটু একা একা থাকতেই ভালোবাসেন নিত্যগোপালবাবু। হয়তো ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগের জন্যই, কিম্বা অন্য কোনো কারণে কে জানে উনি যেন হৈ হুল্লোড় এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। আজ দীর্ঘ আটমাস হলো নিত্যগোপালবাবু জেলখানায়। এই দীর্ঘ আটমাস বাড়ি থেকে কেউ ইন্টারভিউতে আসেনি। কেউ একখানি চিঠি লেখেনি। নিত্যগোপালবাবুও কাউকে লেখেন নি।

—জানো সুব্রত, সমস্ত ব্যাপারটাই কী রকম গোলমেলে। আমি নিশ্চিত যে আমায় সাজা হবে না, কেননা আমি খুন করি নি।

—সেক্ষেত্রে আপনার দুঃখটা হয়তো একান্তই পারিবারিক।

—দুঃখই আমি বোধ করছি না, সেইটাই আমার বিবেককে অপরাধী করে তুলছে, এবং যখন অপরাধবোধ জাগছে তখন আমার চেতনা আমাকে কটূক্তি করছে।

চুপ করে রইল সুব্রত। মেট কেদার কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেছে। কালো-সাদা রোগা বিড়ালগুলো ল্যাজ তুলে গরগর করছে, মাথা ঘসছে ওর পায়ে। ছুটো ফালতু, বিড়াল-ছুটোকে নিয়ে খুনসুটি করছে।

—বস্তুতপক্ষে আমার দাদার সমস্ত সামাজিক পারিবারিক ভূমিকার মধ্যে এমন একটাও জায়গা ছিল না যেখানে একটুও আহা বলা চলে।

—তাহলে আপনি মোটামুটি ঘটনাটাকে সমর্থন করছেন।

—করা উচিত। এবং তা করলে তিনশো-দু ধারার আসামী হতে আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। আসামী হবার ভয়ে নয়, সমর্থন করতে পারছি না বলেই পারছি না। অথচ দায়িত্বও এড়াতে পারি কি? গোটা

মুকুন্দপুর এলাকায় পার্টির নীতিকে আকার দিতে চেয়েছি দিনে রাতে, নিজের কাছে দায়িত্ব এড়াব কেন?

—নীতিটাকে দায়ী করছেন নিত্যদা?

—মোটেই না, নীতি নির্ভুল, এ চেতনা যদি আজ আমার না থাকে, পাগল হয়ে যাব।

—কিন্তু···

—কিন্তু কী?

—ঘটনাটাকে অন্যদিক থেকে দেখ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে।

নৃপেন আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। শুনছিল চুপ করে। এবারে কথা বলল—এটা আপনার ঠিক কথা হলো না নিত্যদা।

—কেন হলো না বুঝিয়ে বল।

—আমরা ব্যক্তিগত সুবিধা যেমন গ্রহণ করি না, ব্যক্তিগত অসুবিধার আঘাতেও আহত হব না। আমার বাবা কংগ্রেসের হোমরাচোমরা ছিলেন। কাকা মন্ত্রী না হলেও মন্ত্রীদলের চাঁই বটে, কিন্তু আমার মা, বাবা-কাকার দোহাই দিয়ে জেল গেটে সুবিধা নিচ্ছেন ভাবতেও পারি না।

—তোমার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার এক হলো না নৃপেন। তুমি আমার ব্যাপারটা বোঝো। দাদা মারা যাবার পর জেলে এসেছি। আজ ন-মাস হলো বাড়ি থেকে কেউ দেখা করতে আসেনি। তার মানে কী?

—বলুন।

—বিচারে যাই হোক না কেন, বাড়ির সবায়ের ধারণা দাদার খুনের ব্যাপারে আমার হাত আছে। আমার বৌদি নিঃসন্তান। দাদার সঙ্গে তাঁর কোনোকালে বনিবনতা নেই। এই বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। সাহায্য করার হেতু হিসাবে বলতেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। সেই বৌদিও আসেন নি। আমরা দু-ভাই। স্বভাবতই আমাদের জ্ঞাতিরা সুযোগ ছাড়ছেন না। তাঁরা বলছেন, আমি সম্পত্তির লোভে দাদাকে খুন করিয়েছি। আরো কল্পনাবিশারদ যাঁরা তাঁরা বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন। বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সাহায্য করত।

ক্লান্ত কণ্ঠে নিত্যগোপালবাবু বললেন—ব্যাপারটা কি এক হলো সুব্রত? সুব্রত হাসল শুধু।

—অথচ খুন করিনি বটে, কিন্তু কৃষক অভ্যুত্থান ঘটুক এ কি আমি

চাই নি? তার জন্যে কি আমার ব্যস্ততা ছিল না, দ্রুততা ছিল না? সুতরাং খুন—

—শুনুন নিত্যদা, অসহিষ্ণু গলায় নৃপেন বলল।—এটা যদি নন্দগোপাল সাঁপুই না হয়ে, শশী মণ্ডল, কি তারক জানা হতো আপনি ভাবতেন এত কথা?

—না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না-ভাবাটা অন্যায় হতো। আবার ভাবলে পার্টির স্ট্রাটেজি ট্যাকটিকস সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে। এই ভেতরকার ঝগড়াটায় ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছি।

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। রোদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে। দক্ষিণের গরাদগুলো দিয়ে তেরছা রোদ এসে পড়ল ঘরের মেঝেয়। নিয়মমাফিক একজন মেট পাহারা একটা লোহার হাতুড়ি নিয়ে প্রতি ঘরের গরাদগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে দেখে যায়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে আওয়াজটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। দমদম জেলের লাল দালানে সূর্যের শেষ রঙ যেন আগুন ধরিয়ে দিল। আবার সন্ধ্যা। দোতলায় সিঁড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ এ সময়টা একবার বাইরের জগৎটা দেখে নেয়। দক্ষিণে জেলারের কোয়াটার্সের পাশ দিয়ে দেখা যায় এক চিলতে যশোর রোড। ওখানটায় বাস থামে। আলো-জ্বালানো বাসের মধ্যে যাত্রীদের মাথার ছায়া। এখান থেকে যেন মনে হয় সকলেই ঘরে ফিরছে। গৃহহারা কথাটা যেন বাজে কথা।

আলি সাহেব 'ই' ব্লকে তিনতলায় থাকেন। প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের আরো কয়েকজনও ঐখানেই থাকেন। একদিন এর মধ্যে সুব্রতকে ওঁরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সুব্রতর মনে হলো আলিসাহেব সুব্রতকে খানিকটা যেন যাচাই করতে চান। পার্টিলাইনের ওপর কতকগুলো ক্লাশ সুব্রত নিতে পারে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। খুব সর্ট কোর্সে নিতে হবে। আণ্ডারট্রায়াল ব্লকে অনেকে এসেছে যারা একেবারে আন্দোলনের খোলা মাঠ থেকে এসেছে, এদের ভেতরে কিছু রাজনীতি দেওয়া দরকার। সুব্রত একটু হেসে বলেছিল—আলিসাহেব তার চেয়ে আপনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন আমাকে। আলিসাহেব ছ-ফুটের ওপর লম্বা। পুরু লেন্সের চশমা। কথা বলার সময় তর্জনীটা উঁচু করে নিজের প্রত্যয়টা সঞ্চারিত করতে চান। তিনিও মৃদু হেসে বললেন—বলো। আলিসাহেব সুব্রতকে অনেক দিন থেকে জানেন, 'তুমি' বলেন।

সুব্রত বলল—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। পার্টি লাইন সম্বন্ধে আমার সংশয় দেখা দিয়েছে।

ঘরের কোণ থেকে কে একজন বলল, সুতরাং ডেন থেকে পালানোর সময় দরকারী কাগজগুলোও আর সামলানো দরকার নেই, কেননা আপনার সংশয় হয়েছে। মানব! সুব্রত অবাক হয়ে গেল।—তুমি কবে এলে।

—আসতেই হলো। আপনাদের আই-পি-এস-এর ধাক্কায় কাজ তো কিস্যু হলো না মাঝখান থেকে ফ্রন্ট ছেড়ে, এ্যাকশন ছেড়ে—

—আপনি মানবের সঙ্গে কথা বলেছেন আলিসাহেব?

—মানব কাল লকআপের পর এসেছে। বেশি কথা হয়নি।

—আপনি মানবের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ডাকবেন। আমি কথা বলব। এর মধ্যে কিছু স্থির করার দরকার নেই।

মানব ধমকে উঠল—শেষ প্রশ্নটা কিসের জানেন?

—কিসের?

—প্রশ্নটা আনুগত্যের।

—কার প্রতি আনুগত্য। এ্যালিজিয়েন্স টু হুম্?

মানব একখানি সাদা কাগজে আঁকা ম্যাপ বার করল। কাল সারারাত ধরে এঁকেছে মানব। বলল:

—এই দেখুন ব্যারাকপুর বেল্টের চেহারা। এই তারা-চিহ্নগুলো দেখুন, কতো নতুন বেস্, এ্যাকশনের সম্ভাবনা। প্রাদেশিক নেতাদের কাছে এটা প্লেস করব। আমি রক্ত দিতে পারি কিনা, আপনি রক্ত দিতে পারেন কিনা—

হামবাগ—মনে মনে স্পষ্ট করে সুব্রত উচ্চারণ করল কথাটা। মানব বলতেই থাকল—মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের তত্ত্ব পুঁথিতে জানলেই হয় না। আপনারা না স্ট্যালিনের পার্টির সদস্য। স্ট্যালিন কী করেছিলেন, যখন যৌথখামারের—

মানবকে থামিয়ে দিয়ে সুব্রত বলল—ম্যাপ একখানা আমিও আঁকতে পারি, আলিসাহেব। তবে তার দরকার হবে না। আমি নামগুলো মুখস্থই বলছি, বিভারলি, ব্ল্যাকবেরি, ম্যাকিনন, ভিক্টোরিয়া দয়ারাম, ব্যারাকপুর বেল্টে ওয়ার্কিং ক্লাস এলাকায় আমাদের কটা বেস নষ্ট হয়েছে। মানববাবু জানেন না?

—তাতে এ প্রমাণ হয় না যে, পার্টিলাইন ভুল। আমরা পার্টিলাইনকে সঠিক রূপ দিতে পারি নি।

—এ তর্কের কোনো মানে হয় না।

সুব্রত আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখল আলিসাহেব বসে আছেন, নিথর স্ট্যাচুর মতো। মানব ম্যাপে আঁকিবুঁকি কাটছে।

এমনি করেই কি দিন যাবে! মন্থর দিন, আর ভারি পাথর রাত এমনি অজন্মায় কেটে যাবে! নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, মাঠে ব্যর্থ চাষী। এই ব্যর্থ ফসলের দেশে তারও কি এমনি কাটবে রাশি রাশি তর্কের আগাছা সৃষ্টি করে। দুপুর হলেই লম্বা লম্বা মিটিং। শেষ হতে চায় না যেন চুলচেরা তর্কের বুকনি। 'প্রস্তাব আছে', আর 'আমার একটা বক্তব্য আছে'। বক্তব্য, মাধ্যম, শ্রেণীশত্রু, কোণঠাসা, বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, প্রতিক্রিয়া প্রগতি—এ যেন পুরনো তেলচিটে একহাত তাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানো। মানব জেলখানায় এসেই সিগারেটের টিন দিয়ে একটা ওজন-দাঁড়ি বানিয়েছে। জেল-কিচেনের বরাদ্দ মাছের ওজন নিয়ে সে আন্দোলন শুরু করবে। জনা-চারেক দেশলাইয়ের বাক্সে ভাতের থালা থেকে যে কাঁকর বেরোয় সেই কাঁকর সংগ্রহ করে রাখছে; জেল-সুপার এলে এ নিয়ে মোকাবেলা করবে। মাঝে মাঝে পাগলা ঘন্টি বাজে। জেল সুপার আসেন যেন মধ্যযুগীয় এক রাজকীয় মহিমা। বিরাট ঝালর লাগানো সাদা ছাতাখানা কয়েদিদের মধ্যে যাঁরা অনুগত তারা বহন করে। আর সেই ছাতার তলায় তলায় বীরপদক্ষেপে হাঁটেন জেলসুপার। আগে পিছে খাতাপত্র নিয়ে কর্মচারী বাহিনী। এরই মধ্যে একদিন সেই ধর্ষণকারীকে দেখল সুব্রত।

শীতের কুয়াসামাখানো পূর্ণিমার গোল চাঁদ গরাদের ওপারে। আজ কতদিন বাদে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে—তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুম আসছিল না। নৃপেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্যদিন হলে এ-সময় ঘুম না এলে সুব্রত পড়ে। আজ সে চুপ করেই তাকিয়ে রইল। এখানে পার্টির সদস্যদের নিজস্ব মিটিঙে বা কোনো সিদ্ধান্তমূলক সভায় তাকে ডাকা হয় না। ফলে সে অনেক সময়ই একা একা থাকে। কখনো নিত্যবাবু, কখনো নৃপেন কখনো কেষ্টদার সঙ্গে, বসে বসে গল্প করে। 'জীবন মানে দ্বন্দ্ব'। দ্বন্দ্বই যদি হয় তবে আজকের পূর্নিমার চাঁদের দ্বন্দ্ব কী? চৌদ্দ দিনের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে আজ কি পূর্নিমার প্রশান্তি নয়? জীবনও কি সব দ্বন্দ্ব পেরিয়ে একদিন দ্বন্দ্ব বিরহিত প্রান্তে

উপনীত হবে? এই পূর্নিমার চাঁদের মতো? সেই কি তার উপসংহার—না নতুন কিছুর উপক্রমণিকা? সেদিন কোনো দ্বন্দ্ব যদি না থাকে তাহলে দ্বন্দ্বের তত্ত্ব কি খণ্ডিত হবে না? কী বোকার মতো ভাবছে সে! দ্বন্দ্ব তত্ত্বে এ পর্যন্তের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যা হয়নি, হবে, তার ভাষ্য আগেই রচনা হবে কী করে। চাঁদের দিকেই তাকিয়ে রইল সুব্রত। গত চৌদ্দ রাত্রির ব্যর্থতাকে এই চাঁদ আজ হারিয়ে দিয়েছে। যদি এই পূর্ণতায় কোনো গ্লানি থাকে তাহলে আবার কাল থেকেই সে শুদ্ধির পথে ক্ষয়ে যেতে থাকবে—যতদিন না অমাবস্থার সর্বনাশের বুকে সকল পুরনো জের ঘুচিয়ে মুছে দিচ্ছে ততদিন এ নতুন শুক্লা প্রতিপদ রচনার ভিত্তি পাবে না। এই চাঁদকেই সে ভালবাসে—এ আপন পূর্ণতার টানে চিরপঙ্গু নদীতেও জোয়ার আনে—চাঁদ—ও চাঁদ চোখের জলে…

—সুব্রতবাবু

—কেষ্টদা, চটকা না ভেঙে গেল যেন সুব্রতর। কেষ্টদার বিছানা ওর ডানদিকে। বিড়ি ধরালেন কেষ্টদা। গ্রামের মানুষ। কড়া বিড়িই পছন্দ করেন। আজ তিন বছর এখানে আছেন।

—ঘুম আসছে না।

—আসুন মশারি তুলে ফেলি। গল্প করা যাক।

—আপনি কিছুর গন্ধ পাচ্ছেন না?

—না তো।

—আমি পাচ্ছিলাম। নতুন গুড়ের পায়েসের গন্ধ। আজ পৌষ সংক্রান্তি সুব্রতবাবু। বোধ হয় জেলারের বাড়ি পিঠে পার্বন।

আস্তে আস্তে কেষ্টদা গ্রামের গল্প শুরু করলেন। বাঙালী মেয়েদের পৌষ জাগার গল্প, পৌষ আগলানোর গল্প। গল্পে গল্পে গ্রামচারী হয়ে ওঠেন কেষ্টদা। জেলখানা যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। হাওড়ার কোন্ গ্রামের পথে পথে, আম-কাঁঠালের জটিল ছায়া যেখানে পূর্ণচাঁদের মায়া বুনছে লোকটা যেন সেখানে হারিয়ে গেল। কথার আওয়াজে আস্তে আস্তে কখন নৃপেন উঠে এল। উঠে এল ওধারের কমল বলে স্কুলের ছেলেটি। কেষ্টদা তখন ভারি গলায় তাঁর মায়ের গল্প শুরু করেছেন। কেষ্টদা ঘুমোলে মা কেষ্টদার মাথায় হাত রেখে ভাঙা গলায় গান করতেন—বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও, আমি নগর মাঙ্গিয়া দেব ঘরে বসে থাইও। গানের কথাগুলো গুণ গুণ করতে লাগল

সকলের কাণের কাছে কতক্ষণ! তখনো কেউ লক্ষ্য করেনি। এটা পৌষ পার্বনের রাত এ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সকলেরই মনটা এমন টলটল করে উঠেছিল যে কেউ লক্ষ্য করেনি। দরাজ গলায় কেষ্টদা যখন গান ধরলেন তখনো সবাই গানের কথায় ভেসেছিল। গান শেষ হলে, গানের রেশ মিলিয়ে গেলে কে একজন বলল—একটা গোলমালের আওয়াজ কানে আসছে না? সে কথাতেও প্রথমে কেউ কান করেনি। একটু পরে আবার একজন বলল, তখন—সবাই সেই গোলমালটা শুনল। জেলের বাইরে, খুব কাছে নয়—কোথা থেকে একটা কলরবের ঢেউ ভেসে আসছে। যেন হাজার মানুষ এক সঙ্গে স্লোগান দিচ্ছে। বোমার আওয়াজ। খুব দূরে নয়। খুব কাছে নয়। দক্ষিণের জানালায় গিয়ে ডেটিন্যু ওয়ার্ডের বি ব্লককে ডাকল এরা। 'বি' ডাকল 'সি' কে। 'সি' ডাকল 'ডি' ব্লককে। দেখা গেল অনেকেই জেগেছিল। অনেকেই রাতে ঘুমোয় না। দেখতে দেখতে সারা দমদম জেলের রাজবন্দীরা জেগে উঠল। গরাদে তারা চেপে ধরেছিল তাদের মুখ। সুব্রত দেখল কমলের মুখ উত্তেজনায় লাল। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, ও বাড়ি থেকে সামনের বাড়ি—কমরেড, কী খবর। খবর কী? সবাই যেন এক প্রাণ হয়ে তাই চাইছিল, কিছু একটা চাইছিল। চনমন করছিল কমল। একবার এ জানলায় একবার ও জানলায় ছুটোছুটি করছিল। তারপর সকলের উদ্বিগ্নতা জমাট পাথরের মতো নীরব হয়ে গেল। কেউ আর কথা বলছিল না বটে কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছিল যে কেউ জানলা ছেড়ে নড়েনি। ডেটিন্যু ব্লক, আণ্ডারট্রায়াল ব্লক যে যার ঘরে লকআপের মধ্যে অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছিল। রাত তিনটের সময় সকলে সচকিত হলো। সেই অপেক্ষমান নৈঃশব্দ্যকে থান থান করে ভেঙে দিল 'ডি' ব্লকের তিনতলার এক কোণ থেকে সুয্যি মিত্তিরের মোটা ভারি কণ্ঠস্বর—কমরেডস, ও কিছু নয়। সবাই যাতে শুনতে পায় তুবার করে বলছিল সুয্যি মিত্তির। ও কিছু নয়। স্লোগানগুলো হচ্ছে আল্লাহ আকবর আর বন্দেমাতরম। কম্যুনাল টেনসন। দাঙ্গা বেধেছে। মজুর এলাকায় একটা বস্তিতে আগুন ধরেছে। পুলিস ফায়ারিং করেছে। মব-এ্যাটাক হয়েছে কতকগুলো এলাকায়। ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্‌বের মতো সাদা মুখে কমল দাঁড়িয়ে থাকল।—কী বলছে, সুব্রত-দা, কী বলছে, বলতে বলতে চুপ করে গেল সে। গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে লাল আলো জালিয়ে দমদম এরোড্রোমের দিকে উড়ে এল একটা বড়ো উড়ো জাহাজ। একচক্ষু দানবের মতো তার লাল চোখটা একবার জ্বলছিল একবার নিবছিল।

ক্রমশঃ

হানের অপরাধ

শিগা নাওয়া

খেলা দেখাবার সময় সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তরুণ বাজীকর হান একটি ভারী ছুরি দিয়ে তার স্ত্রীর করোটিড ধমনী কেটে ফেলে। অকুস্থলেই তরুণীর মৃত্যু ঘটে। হানকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল রঙ্গমঞ্চের পরিচালক, হানের চীনা সহকারী, ঘোষক এবং প্রায় তিন শতাধিক দর্শক। একজন পুলিসও উপস্থিত ছিল। দর্শকদের একেবারে পেছনে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এতগুলি সাক্ষী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এটা হত্যাকাণ্ড না দুর্ঘটনা তা রহস্যাবৃতই থেকে গেল।

হানের খেলাটা ছিল এইরকম: দরজার আকারের একটি কাঠের বোর্ডের সামনে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় চার গজ দূরে থেকে হান কতকগুলি বড় বড় ছুরি তার দিকে ছুঁড়ে মারবে। ছুরিগুলি মেয়েটির দেহের দুই ইঞ্চি দূরে বোর্ডের উপর আটকে যাবে এবং এইভাবে বোর্ডের উপর তার দেহের রেখাটি আঁকা হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার ছুরি নিক্ষেপ করবার পরই হান একবার করে চিৎকার করে উঠবে, তার নিজের বাহাদুরির তারিফ করেই যেন।

বিচারপতি প্রথমে জেরা করলেন রঙ্গমঞ্চের পরিচালককে।

"আপনার কি মত, খেলাটা কি খুব কঠিন?"

"না, ধর্মাবতার, কোনো অভিজ্ঞ বাজীকরের পক্ষে খেলাটা মোটেই কঠিন নয়। তবে হ্যাঁ, খেলাটা ঠিক ঠিক দেখাতে হলে স্নায়ুর জোর চাই, আর চাই একাগ্রতা।"

"বুঝলাম। আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক এটা দুর্ঘটনাই, তবু এই ধরনের দুর্ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক, তাই না?"

"খুবই সত্যিকথা, ধর্মাবতার। দুর্ঘটনা ঘটা খুবই যদি অস্বাভাবিক না হত তা হলে আমার রঙ্গমঞ্চে কিছুতেই এ-খেলা দেখাতে দিতাম না।"

"আচ্ছা, তা হলে কি মনে করেন ইচ্ছে করেই একাজ করা হয়েছে?"

"না, ধর্মাবতার, তা আমি মনে করি না। মনে করি না এই কারণে:

বারো ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে এ-খেলা দেখাতে শুধু যে দক্ষতাই লাগে তা নয়, কি বলব, এক ধরনের স্বাভাবিক অনুভূতিরও দরকার হয়। ঠিক বটে, ভুল হতে পারে এ-সম্ভাবনাটা প্রথমে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি, কিন্তু যা ঘটে গেছে তারপর আমার মনে হয় স্বীকার করা উচিত ভুলের সম্ভাবনা সব সময়ই একটা থেকে যায়।"

"বেশ তো, তা হলে আপনি কি মনে করেন—এটা ভুল না ইচ্ছে করেই একাজ করা হয়েছে?"

"তা আমি ঠিক করে বলতে পারি না হুজুর।"

জজের সব কিছু গুলিয়ে গেল। নরহত্যা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা দুর্ঘটনা না পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। যদি হত্যাকাণ্ড হয় তা হলে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে এটা করা হয়েছে, জজ ভাবলেন।

জজ এরপর সহকারীকে জেরা করবেন ঠিক করলেন, লোকটা পাঁচ বছর হানের সঙ্গে কাজ করেছে।

"হানের স্বভাব-চরিত্র কি রকম?" জজ জিজ্ঞাসা করলেন।

"কোনো খুঁত দেখিনি ধর্মাবতার। ও জুয়া খেলে না, মদ খায় না, মেয়েদের পেছনেও ছুটতে দেখি নি। গত বছর ও খ্রীস্টান হয়েছে। ইংরেজি শিখেছে। অবসর সময়ে ও বই নিয়েই থাকত—বাইবেল বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো বই।"

"ওর স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?"

"তারও কোনো খুঁত দেখিনি, ধর্মাবতার। যারা ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায় সচরাচর তাদের নীতিজ্ঞান থাকে না, তাতো জানেনই স্যার। হানের বৌ খুব সুন্দরী ছিল। অনেকেই তার কাছে কুপ্রস্তাব করত। কিন্তু সে তাতে কোনোদিনও কান দেয় নি।"

"আর ওদের মেজাজ কেমন ছিল?"

"খুবই ভদ্র আর দয়ালু, হুজুর। ওরা ওদের বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করত, কারোর সঙ্গে ওরা কখনও ঝগড়া করে নি। কিন্তু" কথার মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে এক মুহূর্ত কি জানি ভাবল। "ধর্মাবতার, একথাটা যদি আপনাকে বলি তাতে হানের মামলাটা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। তবু সত্যি বলতে কি যারা অন্যের প্রতি এত সদয় ব্যবহার করত তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি নির্মম।"

"কেন?"

"তা আমি জানি না, ধর্মাবতার।"

"তোমার সঙ্গে প্রথম যখন ওদের পরিচয় হয় তখনও কি অবস্থাটা এই রকম ছিল?"

"না, ধর্মাবতার। বছর দুই আগে শ্রীমতী হান একবার পোয়াতি হয়েছিল। সময় পুরো হবার আগেই তার একটি বাচ্চা হয় এবং দিন তিনেকের মধ্যেই সেটি মারা যায়। সেই থেকে ওদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক বদলে যেতে থাকে। প্রায়ই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হত ওদের মধ্যে। হানের মুখ চাদরের মতো শাদা হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ এক সময় সে চুপ করে যেত। কোনোদিন সে তার স্ত্রীর ওপর হাত তোলে নি বা ঐ ধরনের কিছু করে নি—তা হয়ত ওর নীতিধর্মের বিরুদ্ধে যেত। কিন্তু ধর্মাবতার ওর দিকে তাকালেই দেখা যেত কী তীব্র ক্রোধ ঝরে পড়ছে ওর চোখ থেকে। এক এক সময় রীতিমত ভয় করত।

"ওদের সম্পর্কটা এত খারাপ হয়ে পড়েছে দেখে একদিন আমি হানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরা আলাদা হয়ে যায় না কেন। তাতে ও বলেছিল যদিও স্ত্রীর প্রতি ওর ভালোবাসা মরে গেছে তবু বিবাহ বিচ্ছেদের সত্যি কোনো কারণ নেই। শ্রীমতী হান অবশ্যই এটা বুঝতে পারত এবং ক্রমে ওর প্রতি তার ভালোবাসাও মরে গিয়েছিল। আমার মনে হয় নিজের মনকে শান্ত করবার জন্যই হান বাইবেল ও নীতিশাস্ত্র পড়ত, যাতে স্ত্রীর প্রতি ওরা ঘৃণা দূর হয়। স্ত্রীকে ঘৃণা করার সত্যিই ওর কোনো কারণ ছিল না। শ্রীমতী হানের অবস্থাটা সত্যি করুণ ছিল। হানের সঙ্গে প্রায় বছর তিনেক কাটিয়েছে সে আর এই সময়টা সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে খেলা দেখিয়ে। হানকে ছেড়ে দেশে ফিরে গেলে, সেখানে গিয়ে বিয়ে-থা করে থিতু হয়ে বসা সহজ হত না তার পক্ষে। যে মেয়েমানুষ হিল্লি-দিল্লি চষে বেড়িয়েছে কজন তাকে বিশ্বাস করবে? আমার মনে হয় এই কারণেই সে হানকে ছেড়ে যায় নি, ওদের মধ্যে সম্পর্কটা এত খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও।"

"এই হত্যাকাণ্ডটা সম্পর্কে সত্যি তোমার কী মনে হয়?"

"ধর্মাবতার আপনার প্রশ্নটা এইতো, এটা দুর্ঘটনা না ইচ্ছে করে খুন করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ তাই।"

"যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিন থেকেই বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবছি, নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে দেখছি। কিন্তু যতই ভাবছি ততই খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘোষকের সঙ্গেও এ-বিষয়ে কথা বলেছি, সেও বলছে ব্যাপারটা কি ঘটল তা সেও বুঝতে পারছে না।

"আচ্ছা বেশ, এখন বলতো ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন কি মনে হয়েছিল তোমার ? তোমার মনে কি সন্দেহ হয়েছিল এটা দুর্ঘটনা না ইচ্ছাকৃত খুন ?"

"হ্যাঁ, স্যার, তা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম···আমি ভেবেছিলাম, হান শেষে ওকে হত্যা করল।"

"ইচ্ছে করে খুন করল, তাই বলতে চাও তো ?"

"হ্যাঁ স্যার। তবে ঘোষক বলছে ওর মনে হয়েছিল 'ওর হাত ফসকে গেছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক তুমি জানতে, ওতো জানতো না।"

"তা হয়তো ঠিক ধর্মাবতার। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখেছি, আমি জানতাম বলেই হয়তো আমার মনে হয়েছে হান ওকে খুন করেছে।"

"আচ্ছা সেই মুহূর্তে হানের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?"

"সে চেচিয়ে উঠল 'হা', শুনেই আমি তাকিয়ে দেখি ওর স্ত্রীর গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। কয়েক মুহূর্ত সে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর তার হাঁটু যেন ভেঙে এল, দেহটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ছুরিটা পড়ে যেতে সেও মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল তালগোল পাকিয়ে। আমাদের করবার কিছু ছিল না, আমরা ওর দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো বসে রইলাম। আর হান, হানের প্রতিক্রিয়া আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি ওর দিকে তাকাই নি। 'শেষ পর্যন্ত হান ওকে খুন করল'—এই কথাটা মনে হতে তবে আমি হানের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর মুখ মরা মানুষের মতো শাদা হয়ে গেছে। চোখ বোজা। ম্যানেজার পর্দা ফেলে দিল। ওরা যখন শ্রীমতী হানের দেহ তুলে ধরল, তার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। হান হাঁটু গেড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করল।"

"ওকে দেখে কি মনে হয়েছিল খুব বিচলিত হয়েছে ?"

"হ্যাঁ হুজুর খুবই বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল।"

"বেশ। আর যদি আমার কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার হয় পরে তোমাকে ডাকব।"

জজ সহকারীকে বিদায় দিয়ে এবারে হানকেই কাঠগড়ায় তুললেন। বাজীকরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তাকালেই মনে হয় স্নায়বিক অবসাদে ভুগছে।

হান কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে জজ বললেন, "রঙ্গমঞ্চের পরিচালক এবং তোমার সাকরেদকে আমি আগেই জেরা করেছি। এখন তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব।"

হান মাথা নিচু করল।

"আচ্ছা, বল তো, তুমি তোমার স্ত্রীকে কখনও কী ভালোবাসতে ?"

"বিয়ের পর থেকে প্রথম সন্তানের জন্ম পর্যন্ত তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম।"

"সন্তানের জন্মের পর এর ব্যতিক্রম হলো কেন ?"

"কারণ, আমি জেনেছিলাম, সন্তানটি আমার নয়।"

"অন্য লোকটি কে তুমি তা জানতে ?"

"অনুমান করেছিলাম। আমার ধারণা আমার স্ত্রীর মামাতো ভাই।"

"তোমার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ?"

"আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করেছিল সে-ই। সে-ই আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিল।"

"আমি ধরে নিচ্ছি ওদের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল তোমার বিয়ের আগেই।"

"হ্যা হুজুর, আমাদের বিয়ের আটমাসের মধ্যে সন্তানটির জন্ম হয়।

"তোমার সহকারী বলেছে সময় পুরবার আগেই সন্তানটির জন্ম হয়েছিল।"

"আমি সকলকে তাই বলেছিলাম।"

"জন্মের অল্প পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়, তাই না ? কি হয়েছিল ?"

"মায়ের বুকের চাপে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

"তোমার স্ত্রী কি ইচ্ছে করে এ-কাজ করেছিল ?"

"সে বলেছিল, দুর্ঘটনা।"

জজ চুপ করলেন। তাঁর চোখদুটো নিবদ্ধ রইল হানের মুখের ওপর। হান মাথা তুলল কিন্তু চোখ মাটির দিকে রেখেই সে পরের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

"তোমার স্ত্রী কি এ-সব কথা তোমার কাছে স্বীকার করেছে ?"

"না, আমি তাকে কোনোদিন এ-সব কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। শিশুটির

মৃত্যুই ছিল সব পাপের প্রতিশোধ। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যতদূর সম্ভব ওর প্রতি উদার হবো।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদার হতে পারলে না।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার কেবলি মনে হত শিশুটির মৃত্যু পাপের উপযুক্ত প্রতিশোধ নয়। বৌ যখন দূরে থাকত আমি সব বিষয়টা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে পারতাম। কিন্তু ও কাছে এলেই আমার ভেতরে কি যেন হয়ে যেত। ওর শরীর দেখলেই আমার ভেতরে রাগ যেন উথলে উঠতে থাকত।"

"বৌকে তালাক দেবার কথা মনে হয় নি তোমার?"

"তালাক দেবার কথা প্রায়ই মনে হত, কিন্তু বৌকে সেকথা কখনও বলি নি। বৌ প্রায়ই বলত আমি যদি ওকে ছেড়ে যাই তা হলে ওর বাঁচবার পথ থাকবে না।

"বৌ তোমাকে ভালোবাসত?"

"না, ভালোবাসত না।"

"তাহলে ওকথা বলত কেন?"

"আমার মনে হয় ও প্রাণে বেঁচে থাকার কথাই বলত। ওর দাদার দৌলতে ওদের পরিবার উচ্ছন্নে গেছে আর ও ভালো করেই জানত ভবঘুরে বাজীকরের বৌকে কোনো ভালো লোক বিয়ে করতে রাজী হবে না। তার ওপর ওর পা দুটো এত ছোট ছিল যে খেটে খাওয়াও ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"তোমাদের দৈহিক সম্পর্ক কী রকম ছিল?"

"সাধারণ দম্পতিদের যে রকম হয়।"

"তোমাকে কি সে একটুও পছন্দ করত না?"

"আমারতো মনে হয় আমার প্রতি তার এতটুকুও অনুরাগ ছিল না। বলতে কি আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী হিসেবে বাস করাটা ওর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ছিল। তবু ও মুখ বুজে সব সহ্য করত। কী ধৈর্যের সঙ্গে যে ও সহ্য করত, পুরুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমার জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর নির্লিপ্তভাবে ও তা দেখত। আমি সত্য, উন্নত জীবনে পৌছাবার জন্য প্রাণপণে যুঝতাম নিজের সঙ্গে। ও সব দেখত তবু ওর চোখে সহানুভূতির একটু ক্ষীণ ছায়াও কখনও দেখি নি।"

"চরম সিদ্ধান্ত নাও নি কেন? কেন বোঝাপড়া করনি স্ত্রীর সঙ্গে? প্রয়োজন হলে কেন ছেড়ে যাও নি তাকে?"

"তার কারণ, আমার মন নানা আদর্শ দিয়ে ঠাসা ছিল।"

"কী আদর্শ?"

"আমি-চাইতাম বৌয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে যে আমার দিক থেকে যেন কোনো অন্যায় না হয়।···কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।"

"বৌকে মেরে ফেলার কথা কখনও তোমার মনে উদয় হয় নি?"

হান কোনো জবাব দিল না। জজ তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। দীর্ঘ বিরতির পর হান বলল, "ওকে মেরে ফেলার কথা মনে হবার আগে, প্রায়ই ভাবতাম ও মরে গেলে বেশ হয়।"

"আচ্ছা তাহলে, আইন বিরুদ্ধ কাজ যদি না হত তাহলে ওকে তুমি খুন করতে পারতে, তাই না?"

"আইনের কথা ভাবি নি হুজুর। তা ভেবে আমি নিরস্ত হই নি। আসলে আমার প্রকৃতিটাই দুর্বল। তাছাড়া খাঁটি জীবন যাত্রায় প্রবেশের আগ্রহটাও ছিল দুর্বার।"

"তা সত্ত্বেও বৌকে খুন করার কথা তুমি ভেবেছিলে—মানে, পরে ভেবেছিলে আর কি, তাই না?"

"মনস্থির করি নি, কখনও। তবে হ্যাঁ, একবার কথাটা আমার মনে হয়েছিল বললেই সত্য কথা বলা হবে।"

"ঘটনার কত আগে কথাটা তোমার মনে হয়েছিল?"

"আগের দিন রাত্রে···কিংবা হয়তো সেদিন সকালেই।"

"ঝগড়া করেছিলে?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

"কি নিয়ে?"

"ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে তা বলবার কোনো মানে হয় না।"

"তবু বলতে চেষ্টা কর।"

"খাবার নিয়ে। খিধে পেলে আমার মেজাজ চড়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় আলসেমি করে বৌ সময় মতো রান্না করেনি। আমার বেজায় রাগ হয়ে গিয়েছিল।"

"ঝগড়াটা কি বড় বেশি জোর হয়েছিল?"

"না, কিন্তু পরে মনে মনে আক্রোশ ফেনিয়ে উঠেছিল। সেইটেই ছিল অস্বাভাবিক। জীবনকে কী করে উন্নত করা যায় তাই নিয়ে বড়ো বেশি ভাবছিলাম কয়েক সপ্তাহ ধরে। আর যত ভাবছিলাম ততই বুঝতে পারছিলাম ও বিষয়ে আমার কিছুই করণীয় নেই। মনটা তাই হয়তো খিঁচড়ে ছিল। শুয়েও ঘুম আসছিল না। যত বাজে চিন্তা ভিড় করে আসছিল। আমি অনুভব করছিলাম যা আমার লক্ষ্য তাতে কখনও পৌছাতে পারব না। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার জীবনের এই ঘৃণ্য দিকটা থেকে আমার মুক্তি নেই। মনে হয়েছিল এই নৈরাশ্যকর অবস্থার জন্য দায়ী আমার বিয়ে। আমি এই অন্ধকার থেকে বেরোবার জন্য মরীয়া হয়ে আলোর একটু রশ্মী খুঁজছিলাম, কিন্তু এমন কি এই আকাঙ্ক্ষাও যেন নিভে আসছিল। রেহাই পাবার একটু ক্ষীণ আশা তবু মনের মধ্যে দপ দপ করছিল। আর আমি মনে মনে জানতাম রেহাই যদি পাই সে হবে আমার মৃত্যু।

"আর তখনই আমার মনে কুৎসিৎ চিন্তাটা ছায়া ফেলতে লাগল, 'ও যদি মরে যায়! যদি মরে যায়! কেন তাহলে ওকে আমি মেরে ফেলব না?' এই পাপের বাস্তব পরিণাম কী হবে সে ভাবনার তখন আমার কাছে দাম ছিল না।' সন্দেহ নেই আমাকে জেলে যেতে হবে। কিন্তু জেলের জীবন এর থেকে খারাপ হবে না, ভালোই হবে বরং। কিন্তু তবু আমার কেমন মনে হয়েছিল বৌকে হত্যা করেও কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। সে হবে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া, আত্মহত্যার মতো। নিজেকে তাই মনে মনে বললাম, দিন দিন যত দুঃখ আসুক মুখ বুজে আমাকে তা সয়ে যেতে হবে। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। দুঃখ ভোগ—এই হয়ে উঠেছে আমার সত্যিকারের জীবন।

"আমার মন যখন এই দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন ভুলেই গিয়েছিলাম আমার সকল দুঃখের কারণ আমার পাশেই শুয়ে। একান্ত অবসন্নভাবে আমি শুয়েছিলাম, ঘুমুতে পারছিলাম না। ভোঁতা একটা শূন্যতা নেমে এল মনে, আমার পীড়িত মন নিঃসাড় হয়ে এল, বৌকে খুন করার কথা একটু একটু করে মিলিয়ে গেল মন থেকে। দুঃস্বপ্নের পর যেমনটা হয়ে থাকে আমার মন ভরে গেল একটা বিষন্ন শূন্যতায়। মনে হলো সৎ জীবনযাপনের শুভ সংকল্পগুলির কোনোটাকেই বাস্তবে রূপায়িত করা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়—এতই দুর্বলচিত্ত আমি। রাত যখন ভোর হলো তখন দেখলাম আমার স্ত্রীও ঘুমোয় নি…"

"যখন ঘুম ভাঙল তখন কি পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করেছিলে তোমরা?"

"আমরা একটি কথাও বলি নি।"

"ব্যাপারটা যখন এতদূর গড়াল তখন ওকে ত্যাগ করো নি কেন?"

"ধর্মাবতার, আপনি কি মনে করেন এতে আমার সমস্যার সমাধান হতো?" না, না, সে হতো সমস্যাকে পাশ কাটানো। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমার সংকল্প ছিল স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করব যাতে কেউ আমার কোনো দোষ না ধরতে পারে।"

হান আকুলভাবে জজের দিকে তাকাল। তিনি মাথা নেড়ে ওকে বলে যেতে নির্দেশ দিলেন।

"পরদিন নিজেকে খুবই অবসাদগ্রস্ত মনে হলো। স্নায়ুগুলো সব যেন রুক্ষ হয়ে থাকল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। জামা-কাপড় পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, শহরের নির্জন রাস্তাগুলিতে এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়ালাম। জীবনের জট খুলবার জন্য কিছু একটা করা দরকার, বারে বারে এই কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল কিন্তু খুন করার কথাটা আর মনে আসে নি। আসলে আগের রাত্রির হত্যার সংকল্প আর অপরাধের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা ফারাক ছিল। সত্যি বলতে কি, বিকেলের খেলাটার কথা আমার একবারও মনে হয় নি। মনে হলে, ছুরির খেলাটা আমি দেখাতে যেতাম না। তার বদলে ডজনখানেক অন্য খেলা দেখান যেত।

"যাই হোক, বিকেল হলো। আমাদের খেলা দেখাবার পালা এল। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তা আমার একবারও মনে হয় নি। রোজকার মতোই কাগজ ফালাফালা করে কেটে ছুরির ধার দেখালাম। বোর্ডের উপর ছুঁড়ে মারলাম কয়েকটা ছুরি। অল্পক্ষণের মধ্যে আমার স্ত্রী এলো ঝলমলে পোশাকে সেজেগুজে। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসিতে দর্শকদের আপ্যায়িত করে সে বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি একটা ছুরি তুলে নিয়ে তার থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"গত সন্ধ্যার পর সেই প্রথম আমাদের চোখাচোখি হলো। সেই প্রথম

আমি সচেতন হলাম সেই সন্ধ্যায় ঐ খেলাটা দেখাতে গিয়ে কতবড় ঝুঁকি নিয়েছি। স্নায়ুগুলোকে আমার বশে রাখতে হবে, অথচ অবসাদ আমার একেবারে মজ্জায় প্রবেশ করেছে। আমি বুঝতে পারলাম নিজের বাহুর উপরও আর বিশ্বাস রাখা যায় না। নিজেকে সংযত করার জন্য এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম। আর তখন অনুভব করলাম আমার সারা শরীর কাঁপছে।

"এইবার সময় হয়েছে। এইবার ওর মাথার উপর তাগ করে ছুরি ছুঁড়লাম, স্বাভাবিক থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে সেটা বিঁধে গেল। আমার স্ত্রী হাত উঁচু করল। তার বাহুর ঠিক নিচে ছুরি তাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথম ছুরিটা যখন আমার আঙুলের ডগা থেকে মুক্ত হলো কে যেন আমার হাত টেনে ধরেছে, ছুরিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগবে তার ওপর যেন আমার কোনো হাত নেই। যেখানে তাগ করেছি ছুরিটা সেখানে গিয়ে লাগাটা যেন ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার প্রত্যেকটি নড়াচড়া যেন জোর করে সচেতনভাবে করতে হচ্ছিল।

"স্ত্রীর কাঁধের বা দিকে তাগ করে একটা ছুরি ছুঁড়লাম। তারপর ডান দিকে আর একটা যখন ছুঁড়তে যাচ্ছি তখন হঠাৎ নজরে পড়ল ওর চোখে-মুখে কেমন অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মনে হলো আতঙ্কে ওর মুখটা শাদা হয়ে গেছে। ও কি তবে বুঝতে পেরেছিল নিমেষের মধ্যেই ছুরিটা এসে ওর গলায় বিঁধে যাবে? আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল; প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। প্রায় মরীয়া হয়ে শূন্যের দিকে তাগ করে ছুঁড়ে দিলাম ছুরিটা···।"

জজ স্তব্ধ হয়ে হানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

"হঠাৎ আমার মধ্যে ঠেলে উঠল এই চিন্তা, ওকে আমি খুন করেছি," দড়াম করে বলল হান।

"ইচ্ছে করে, কেমন?"

"হ্যা। আমার মনে হয়েছিল ইচ্ছে করেই করেছি।"

"শুনলাম ঘটনার পর তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেছিলে।"

"হ্যা, স্যার। ফন্দীটা আমার মাথায় নিমেষের মধ্যে খেলে গিয়েছিল। জানতাম সকলেই আমাকে খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী বলে জানে। কিন্তু প্রার্থনার

ভান করতে করতে আসলে আমি কি করতে হবে না করতে হবে মনে মনে তারই হিসাব করছিলাম।

"তা হলে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তুমি যা করেছিলে ইচ্ছে করেই করেছিলে?"

"আমি বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"তোমার কি ধারণা-এটা যে একটা দুর্ঘটনা লোককে তা বিশ্বাস করতে পেরেছিলে?"

"হ্যা, কিন্তু সে কথা এখন ভাবলে আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি শোকাভিভূতের ভান করেছিলাম কিন্তু কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোক থাকলে সে তক্ষুনি বুঝতে পারত আমি আমি অভিনয় করছিলাম। সে দিন সন্ধ্যায় আমি মনে মনে ভেবে দেখেছিলাম আদালত থেকে আমার মুক্তি না পাবার কোনো কারণ নেই, কেননা সত্যি সত্যি আমার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। সবাই যদিও জানে স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না কিন্তু আমি যদি বরাবর বলে যাই এটা দুর্ঘটনা তাহলে তা যে মিথ্যে তা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলাম যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলে বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই চালিয়ে দেওয়া যায়।

"আর তখনই হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন জাগল, আমি নিজেই বা কেন বিশ্বাস করছি না এটা দুর্ঘটনা? আগের রাত্রে আমি ওকে খুন করার কথা ভেবেছিলাম। এমনটাও তো হতে পারে সেইজন্যই এখন মনে হচ্ছে ঘটনাটা স্বেচ্ছাকৃত? এইভাবে এমন একটা অবস্থায় পৌছালাম যখন মনে হলো ব্যাপারটা সত্যিই কি ঘটেছে তা আমি নিজেই জানি না। তখন আমার মনে সুখ হলো, অসহ্য সুখ। ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি।"

"ব্যাপারটা দুর্ঘটনা বলে স্থির করতে পেরেছিলে বলে?"

"না তা বলতে পারি না: স্বেচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তখন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তাই স্থির করলাম মুক্তির সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মনে যা আছে সব খোলসা করে বলে দেওয়া। দুর্ঘটনা বলে নিজেকে বা অন্যকে প্রতারণা করে লাভ নেই। তার চেয়ে সোজাসুজি বলি না কেন কি ঘটেছিল আমি তা জানি না। ভুলে হয়েছে বললে সত্য

বলা হবে না, আবার ইচ্ছাকৃত বললেও মিথ্যে বলা হবে। বলতে কি আমি নিজেকে দোষীও বলতে পারি না, নির্দোষও না।"

হান চুপ করল। জজও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর চিন্তিত ভাবে মৃদু কণ্ঠে বললেন :

"তুমি যা বললে, মনে হচ্ছে সত্যিই বলেছ। তবু আর একটা প্রশ্ন, তোমার স্ত্রীর মৃত্যুতে একটুও কি দুঃখ অনুভব করছ ?

"একটুও না। যখন স্ত্রীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতাম তখন ভাবতেও পারি নি ওর মৃত্যুর কথা বলতে এত আনন্দ অনুভব করব।"

"ঠিক আছে", জজ বললেন, "এবারে তুমি নেমে দাঁড়াতে পার।"

নিস্তব্ধভাবে মাথা নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হান। অদ্ভুত একটা আবেগে অভিভূত হয়ে জজ কলম তুলে নিলেন। টেবিলের ওপরে ছড়ানো দলিলগুলির ওপর লিখলেন "নির্দোষ।"*

অনুবাদ : বৈদ্যনাথ সেন

* শিগা নাওয়া (জন্ম ১৮৮৩) আধুনিক জাপানের একজন অগ্রগণ্য লেখক।

পরিকল্পনার সংকট

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

[বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো ও গতি-প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তাতে এখনকার আর্থিক পটভূমি বুঝি যাবে। ইতিমধ্যে দেশের জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এবারের বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে। আলোচনা যা হয়েছে তাতে দেখা যায় তৃতীয় পরিকল্পনার নির্দিষ্ট বরাদ্দ ও লক্ষ্যের দিক থেকে কোনো কাটছাঁট করা হবে না। দেশরক্ষাগত শিল্পের প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হবে বলা হয়েছে ; এ প্রসঙ্গে এবারের বাজেট উল্লেখ-যোগ্য এবং আলোচনার যোগ্য। মূল প্রবন্ধের বিষয়টি বুঝে নিলে বর্তমান আয়োজনের মূল পটভূমি জানা হয়ে থাকবে। এখন পর্যন্ত পরিকল্পনার মৌলিক কাঠামো ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে সরকারী নীতির কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত আমরা পাই নি। বর্তমান বাজেটের কর-স্থাপন দেখে ও তৎসম্পর্কে দেশের (ও বিদেশের ?) ধনিকশ্রেণী যেরূপ নিজেদের স্বপক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছে তাতেও বুঝা যায় পরিকল্পনার পদ্ধতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার কি পরিমাণে ঘটেছে।—লেখক]

আমাদের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির একটা যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যেই পরিকল্পনার সংকট বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের পরিকল্পনা মিশ্র-অর্থনীতি-ভিত্তিক বলা হয়। বেসরকারী বিনিয়োগের সহযোগে পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সাহায্যে আমাদের দেশে আর্থ-নীতিক উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও আর্থ-নীতিক ক্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রনের পরিমাণ, বেসরকারী বিনিয়োগ ও কর্তৃত্বের তুলনায় এত সীমিত যে আমাদের মতো নিম্নজীবনমান-সংবলিত ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার দেশে আর্থিক উন্নয়ন বাঞ্ছিত পথে ঘটে না। সীমিত অথচ পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ জনবহুল অনুন্নত অর্থনীতির অচলতা দূর করবার কাজেই শুধু ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এসব দেশে কেইনসের ভাষায় "To set the ball rolling"-এর কাজ করে। পরবর্তী কাজ করে এইসব ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানা। তাই এসব দেশের শিল্পায়নের

অগ্রগতিতে সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণসাধন হয় না। বিশিষ্ট ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ চার্লস বেথেলহেমের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—আমাদের অর্থনীতিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন: "With a private sector much larger than the public sector, it is practically impossible to allocate investments and to select techniques which would be in conformity with the needs of a rapid and planned economic growth." (Studies in the Theory of Planning) বাস্তবিক কমিউনিস্ট দেশগুলির কথা বাদ দিলেও পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে যে পরিমাণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনুসৃত হয়ে থাকে তার তুলনায় ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির দেশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেক কম। অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল লিখেছিলেন, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপে যেটুকু আয়-বণ্টনের চেষ্টা হয়ে থাকে ভারতের ক্ষেত্রে তাও ঘটে না।

একটা হিসেব থেকে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ উন্নয়ন বাবদ সরকারী ক্ষেত্রে মোট লগ্নীর পরিমাণ হলো ৬৯০ কোটি টাকা আর বেসরকারী ক্ষেত্রে খনি, বাগিচা, গৃহাদি প্রভৃতি বাবত লগ্নীর পরিমাণ ১৭০০ কোটি টাকা। তাছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল, বেসরকারী মালিকানায় লগ্নীর পরিমাণ লক্ষ্যকে পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্রেই ৯০০০ কোটি টাকা বাড়তি লগ্নী ঘটেছে; আর সেক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ লক্ষ্য থেকে শতকরা ২০ ভাগ পেছিয়ে রইল।

অর্থাৎ তুলনায় বেসরকারী ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারণশীল। অবশ্য বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নতমান অপ্রধান ভোগ্য পন্যের (non-priority consumption goods) ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-পরিমাণ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। রেয়নশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে ২২০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ৫৭০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত করার ব্যাপার থেকে বিষয়টি প্রকট হয়। তাছাড়া, অটোমোবাইল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রকযন্ত্র, রেফ্রিজারেটর, আধুনিক কায়দায় সৌখীন গৃহ নির্মাণে বিপুল ব্যয়ের পরিমাণ থেকেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। অথচ ভারী ও মূল শিল্প ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর দিক থেকে পরিকল্পনার লক্ষ্য থেকে আমরা পেছিয়ে রইলাম অনেকটা। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও দেখা যাচ্ছে যেখানে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হবে পূর্বাপেক্ষা ১½ গুণ, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানায় বিনিয়োগ হবে পূর্বের

তুলনায় ১⅔ গুণ। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা সাহায্য দেবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর। অথচ যেক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী শিল্পে মুনাফার হার শতকরা ৭% এবং বিভিন্ন অপ্রধান ক্ষেত্রে বিপুলভাবে বেসরকারী বিনিয়োগ ঘটছে, সেক্ষেত্রে এইটেই আশা করা উচিত যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে সংগৃহীত মুনাফার মোটা অংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সত্যিকারের উন্নয়নমূলক বিনিয়োগে লগ্নী হিসেবে ফিরে আসবে। অর্থাৎ সত্যিকারের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার একটা আদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়ে উঠছে।

একথা বলা চলে আমাদের পরিকল্পনায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বেসরকারী মালিকানার স্বার্থে শিল্পে ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় production accumulation-এ ও ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দুটি উদ্দেশ্য চোখে পড়ছে; প্রথমত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ব্যবহারের সাহায্যে জনসাধারণের উপর কর বসিয়ে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগমূলক মূলধন সংগ্রহ ও ভারী ও মূল শিল্পে লগ্নী করা—যার ঝুঁকি বহন ও যার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল মূলধন সংগ্রহ ভারতের বর্তমান ধনিক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। একাজ যেদিন ক্রমশ সম্ভব হবে সেদিন এ-সব ক্ষেত্র থেকেও রাষ্ট্রকে সরে দাঁড়াতে হতে পারে। সে লক্ষণও পরিস্ফুট। এ প্রসঙ্গে ভারতের ধনিকপ্রবর শিল্পপতি শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার একটি উক্তি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি লিখেছেন: "It appears now that the policy of Government is changing. It has been publicly said by the responsible ministers only recently that they desire to shift gradually more towards the private sector; the future pattern of investment seems to be a ratio of 1 to 2. That is, one for the public and two for private. (Journal of Commerce, P-1; Oct. 7, 1957)

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ও স্বল্প দায়িত্বে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ করা, যাতে বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্র উপকৃত হবে অথচ বৈদেশিক শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শঙ্কাও রইল না। আর এই কারণে আরও কিছু দিন বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানার কর্তৃত্ব—তা সে যতটুকুই হোক—মাথা পেতে নেবে।

বেসরকারী মালিকানার দিক থেকে উপরের দুটি উদ্দেশ্যই সত্যি সার্থক হয়েছে। শিল্পোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারী শিল্পের প্রসারও পূর্বের তুলনায় মোটামুটি ভালোই হয়েছে বলা চলে। বৈদেশিক সাহায্যও বেশ মোটা রকমই পাওয়া গেছে। আবার বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ হয়েছে যা প্রাক-পরিকল্পনা-কালের প্রায় দ্বিগুণ। আগে বলেছি, ব্যক্তিক্ষেত্র ও ব্যক্তি মুনাফার পরিমাণ তুলনায় অনেক দ্রুত তালে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে টাকার বাজার, অন্যভাবে বলি ফিন্যান্স ক্যাপিটাল, আমাদের অর্থনীতিতে প্রসারিত ও সুসংগঠিত হয়েছে এবং বেসরকারী মালিকানাও এই সূত্রের উপর ক্রমশ মূলধন সংগ্রহের জন্য অধিকতর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ পরিণামে এ দিক থেকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং স্বভাবতই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পরিধি ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

কিন্তু পদকের অন্য পৃষ্ঠায় ভিন্ন ছবি, যে ছবিতে এই ধরণের উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ জাতীয় আয় সাবিকভাবে বৎসরে অত্যন্ত অল্প হারে অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং মাথাপিছু বৃদ্ধির হার মাত্র ১·৫%। আর ধনবৈষম্যমূলক অর্থনীতিতে মাথাপিছু বৃদ্ধির রহস্য যে কি তাও সবার জানা। তাছাড়া, আরও একটা কথা স্মরণীয়। মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিতে এই সামান্য ১·৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছে। আর মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিতে কোন শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পায় তা সবার জানা। কাজেই ১·৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে কারা উপকৃত হচ্ছে তা আর বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন, এই সামান্য বৃদ্ধির গতি কিন্তু নিম্নমুখী। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেখানে আয় বৃদ্ধির হার ১৫% সেখানে প্রথম পরিকল্পনায় সেই হার ছিল ২০%। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের হার যে স্বল্প সেই স্বল্পই থেকে গেল। প্রথম পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তা বেড়ে হলো মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। তৃতীয়ত, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিনিয়োগ লক্ষ্যানুযায়ী ঘটল না—তা লক্ষ্য থেকে ২০% ভাগ পেছিয়ে পড়ে রইল। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যালান্স সমস্যা হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারণ সম্ভব হলো না।

প্রথম তিনটি সমস্যার জন্য রাষ্ট্রীয় কর-নীতি অনেকখানি দায়ী। আবার

তা ব্যাপকতর ব্যক্তিক্ষেত্র-প্রধান অর্থনীতিতে সীমিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ফল। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত মোট সরকারী আদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ ৬০% ভাগ থেকে ২৭·৪% ভাগে নেমেছে। অথচ প্রত্যক্ষ করপ্রদানকারী শ্রেণী জাতীয় আয়ের যে অংশ পেয়েছে তা ঐ সময়ে ৭·৯% ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯·৩% ভাগে উঠেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর থেকে আদায়ের পরিমাণ হলো ১০৫২ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে ৮০% ভাগ আদায় করা হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় করনীতির সীমাবদ্ধতার আরেকটি নিদর্শন ১৯৬১ সনের ২৩ মে'র স্টেটসম্যান কাগজ উল্লেখ করেছেন। কলকাতার বেসরকারী শেয়ার বাজার কাটনি মার্কেট প্রখ্যাত। এই কাটনি শেয়ার বাজার গত কয়েক বছরে সরকারী শেয়ার মার্কেট অপেক্ষা ক্রমশ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই বাজারে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ হলো ১০ কোটি টাকা। অথচ এই বিপুল টাকার লেনদেনের উপর কর বসিয়ে সরকার বেশ লক্ষণীয় পরিমাণ আর্থনীতিক সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারতেন; ফলে, পরিকল্পনার রসদাভাব কিছুটা দূর হতে পারত। ১৯৬১ সনের ২৩ মে'র স্টেটসম্যান কাগজ যথার্থই লিখেছিলেন: "According to an export estimate the Govt. of India would not have had to impose quite such heavy excise duties and cause quite such hardships to the ordinary citizens, if steps were taken to recover the Govt's share from the vast untaxed money that floats in the katni market daily".

বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্স সমস্যার একটি অন্যতম কারণ; বেসরকারী-ক্ষেত্রপ্রধান সীমিত পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগমূলক অর্থনীতিপুষ্ট উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উন্নতমান ভোগ্য পণ্যের চাহিদা এবং সেই চাহিদা তৃপ্তি করবার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ ভোগ্য পণ্যের আমদানী অথবা ঐ সব ভোগ্য পণ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কারিগর বিশেষজ্ঞ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানী। যদিও ঐসব পণ্য বা শিল্প ভারতের বর্তমান আর্থনীতিক অবস্থায় মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। অথচ ঐসব শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য, অথবা ঐসব ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে রসদাভাব ঘটছে বা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তাদের প্রসারণ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রেয়ন

শিল্পের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী মালিকানায় রেয়ন উৎপাদন ক্ষমতাকে ১৯৫৬-৫৭ সনের ২২০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড করা হয়েছে এবং উৎপাদনের ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছে। অথচ ঐ সময়ে ভারী ও মূল শিল্পের প্রসার রসদাভাবে লক্ষ্য থেকে ২০% ভাগ পেছিয়ে রইল। আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় খসড়া রিপোর্টে প্রথমে বলা হলো, কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে এবং উৎপাদন চালু রাখতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় বলে পরিকল্পনায় রেয়নের উৎপাদন-প্রসারণের গুরুত্ব দেওয়া হবে না (পৃঃ ২০৬-২০৭—খসড়া রিপোর্ট)। অথচ চূড়ান্ত রিপোর্টে দেখা গেল—বলা হয়েছে অন্যান্য শিল্পের সাথে সাথে রেয়নের উৎপাদনও বাড়ানো হবে। আবার ১৯৬২ সালের জুন মাসের খবরে প্রকাশ, ১৩টি রেয়ন শিল্পের কাঁচামাল 'পাম্প' তৈরির কারখানা এবং রেয়নের স্থতো তৈরির জন্য ৯টা নতুন কারখানা বসাবার আবেদন সরকার মঞ্জুর করেছেন। নীতির এই পরিবর্তনের কারণ কি? রেয়ন শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় পড়ে এবং এই শিল্পে মুনাফা অনেক। তাছাড়া এই শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ব্যাপারে যে সব শিল্পপতির স্বার্থ জড়িত তাঁরা হলেন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানার অন্যতম প্রতিনিধি। এঁরা হলেন, বিড়লা, সিংহানিয়া, সাহু জৈন ও দক্ষিণ ভারতের শেমারী ব্রাদার্স। এঁদের স্বার্থের নির্দেশেই সরকারী নীতি নিধারিত হয় ও আবার প্রয়োজন হলে পাল্টায়ও। পরিকল্পনা অর্থনীতিবিদ প্যানেল-সদস্য অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল লিখেছেন: "Both import and export license have been controlled *adhoc* throughout the Plan decade and never been connected with a path of industrialisation and in relation to long-term planning." আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো, দেশের আভ্যন্তরীন মূল্যবৃদ্ধি যার আবার একটি অন্যতম কার ণ কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতা, এবং অপরটি হলো, রাষ্ট্রের পণ্যমূল্য ও ভোগ-নিয়ন্ত্রন নীতির অভাব।

কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতার ফল, অতীব শ্লথ কৃষি উৎপাদন অগ্রগতির দরুণ কতকগুলি বিরোধের সূত্রপাত। প্রথমত, কৃষিগত কাঁচামালের প্রয়োজন ও তার যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্যের আকারে শিল্পায়ন ও কৃষি-উন্নয়ন গতির

মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়ত প্রধান মজুরী পণ্য (Wage-goods) খাদ্যশস্যের, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবপ্রসূত দ্বন্দ্ব এবং এর ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের প্রকৃত আয়কে অতি নিম্ন স্তরে বেঁধে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে তৃতীয় বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হলো, একদিকে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা ও স্বল্প-আয়-সম্বলিত জনসাধারণের এই সব পণ্যের সীমিত চাহিদার বিরোধ। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (idle capacites) এবং অবিক্রীত বিপুল পণ্য-মজুতের পরিমাণ এই বিরোধের সূচক।

কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে একথা বলা চলে আজও শিল্পায়নোপযোগী কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত সংস্কার সাধন সম্ভব হলো না। ফলে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকার জনসংখ্যাবৃদ্ধির তালে বেড়ে চলে এবং তার ফলে ও প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের উপস্থিতি ও সক্রিয়তার দরুণ কৃষি-অর্থনীতির বাড়তি ফসল শিল্পমুখী হয় না বা হলেও ঐ সব স্বার্থের চক্রান্তে কৃত্রিমভাবে বর্ধিত মূল্যে বাজারে আসে। "Most of the food surplus is produced by the peasants and generally reaches the market through a series of *dalal* middle men who buy in advance—on speculation. These *dalals* are often money-lenders as well. Competition between them is restricted. Most peasants are under debt-vassalage either to rich peasant propriotors or to these middle men. Capitalist agriculture for the more important cash crops (cotton groundnuts, tobacco, fruit) exist as also for general farming, but the total percentage in negligible." ভূমি সংস্কার নীতি যা আমাদের দেশে আংশিকভাবে অনুস্যৃত হয়েছে তার ফলে নতুন কৃষক শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছে, আমাদের অর্থনীতির কাঠামোতে। বড়ো বড়ো আড়তদার দোকানদার শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা আবার মহাজনও বটে, কখনই রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর মূল্য নিয়ন্ত্রনের সম্মুখীন হতে হয় না। কাজেই সেই সুযোগে নিজেদের ইচ্ছামত কৃত্রিমভাবে যোগান সীমিত করে কালোবাজারী অর্থনীতিকে আরও উৎসাহিত করতে থাকে। বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের মধ্যেও এই প্রবণতা প্রবল। এই ধরনের বহু বড়ো কৃষক মহাজন

দালালী' ফড়িয়া চক্রের অস্তিত্ব যতদিন স্বীকৃতি পাবে এবং গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করবার স্বাধীনতা ভোগ করবে ততদিন শিল্পায়ন ও বর্তমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন যোগান বাড়ানো সম্ভব হবে না কিছুতেই। গত এক যুগের অভিজ্ঞতাই তাই বলে। কৃষি-অর্থনীতির ব্যর্থতা শুধুমাত্র যে মোট উন্নয়নের দিক থেকে শিল্পক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাদন যোগানের অক্ষমতারূপে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে তা নয়। এর আরেকটা ইতিবাচক দিকও আছে; তা হলো রাষ্ট্র কর্তৃক সেচ ব্যবস্থা, সমষ্টি উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতি বাবদ যে বিপুল অর্থব্যয় এই গত কয় বৎসরে করা হয়েছে একদিকে তার কোনোরূপ প্রতিদানে কৃষি-অর্থনীতির ব্যর্থতা এবং অপরদিকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত কাঁচামাল আমদানী বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থের অপব্যয়। একথাটা এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকেও উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত উন্নয়ন এবং উৎপাদন সম্পর্কগত কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র অর্থ লগ্নীর ফল কৃষি-অর্থনীতির আরও অবনতি এবং মুষ্টিমেয় বড়ো কৃষক-মহাজন-ব্যবসায়ী চক্রের আরও পুষ্টিসাধন। কৃষি উৎপাদনের যে কর্মসূচী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে তাতে মূল সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। বেশি পরিমাণে সার, জল, গুদাম, ঋণ প্রভৃতি বর্তমান কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কগত ব্যবস্থায় তারাই পায় এবং পেয়েছে যারা জমির মালিক, প্রকৃত চাষী নয়।. ভূ-সম্পত্তির মালিকানা কাঠামোতে মূলত কোনো বদল হলো না। বরং জমিদারী আইন এড়িয়ে জমি কেন্দ্রিকতা বেড়েছে। নগদ টাকায় মজুরী দিয়ে চাষ করবার ধনতান্ত্রিক প্রথা আমাদের অর্থনীতিতে চালু হয়েছে এবং এই লক্ষণীয় প্রথার প্রসারের জন্যই বিকৃত উদ্দেশ্যে সমবায়ী ঋণও ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ যে সীমিত ও অপূর্ণ সমবায়-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত হচ্ছে তা প্রকাশ্যে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনেই সাহায্য করছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দরুণ বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন ও যন্ত্রীকরণ এবং কৃষি-শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি-অর্থনীতির এইটাই প্যারাডক্স। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, তৃতীয় পরিকল্পনাতে কৃষি-সংগঠন ও উৎপাদন সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিতে বিপুল টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ প্রথম থেকে উৎপাদন সংগঠন ও সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র খাদ্যের বাজারে ফাটকাদারি বন্ধ করতে পারলে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রোল ও

রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেও যে সুফল ঘটত তাতে কৃষিতে এত বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো না। বিশেষ করে যেখানে ভারী ও মূল শিল্পে বিনিয়োগপযোগী মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে এইসব ব্যবস্থার সাহায্যে মূলধন বিনিয়োগের অপচয় বন্ধ করা উচিত। কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করাই উন্নয়নের প্রথম স্তরে মূলধন সংগঠনের পথ। অথচ আমাদের দেশে তা না করে বরং যে মূলধন বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগ হতে পারত তা কৃষিতে লগ্নী করা হচ্ছে। প্রথম দিকে শিল্পের প্রসার ঘটালে সেই শিল্প থেকে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি হতো এবং তার ফলে কৃষি-উৎপাদনপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারত। এর ফলে আবার একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, আমদানী বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন কালের খাদ্য সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। অথচ এ পথে না গিয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হারও হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অর্থনীতির আরেকটি দুর্বলতার দিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তা হলো বেকার সমস্যার দিক। বাস্তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনো বিশ্লেষণ না করে কেবল হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনার রিপোর্টে বলা হলো: "The increase in employment during the Second Plan has not kept pace with the growth of the labour force. It was hoped that the developmeut programmes envisaged would lead to the creation of 8 million additional jobs outside agriculture. The achievement for the plan period is at present estimated at about 6·5 million," পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করলেন যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাবে। ১৯৫৫-৫৬ সালের বেকারের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, বর্তমানে তার পরিমাণ ৭৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৫ লক্ষে। মনে রাখা দরকার কৃষিক্ষেত্রের বাইরের এই হিসেব। এই হিসাবে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যে ১৫ লক্ষ লোক নতুন কাজ পেয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৩৫ লক্ষ লোক সেখানে নতুন কাজ পাবে। অথচ সবাই জানি, কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি সরিয়ে আনাই যেখানে মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা সেখানে এত বেশি লোককে নতুন করে কৃষিতে কোনো প্রকারেই নিয়োগ করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থায় বেকারের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের দিকটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের অনুপাত এমনভাবে সাজান হয়েছে যে এতে স্বনির্ভরশীল স্তরে পৌঁছানোর অভিযান শুরু করা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া 'রাষ্ট্র শিল্পক্ষেত্রে' বেশির ভাগ বিনিয়োগ হবে পুরনো অর্ধনির্মিত উৎপাদনক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও যে সব শিল্প লক্ষ্যানুযায়ী উৎপাদন করতে সমর্থ হয় নি বা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যে সব শিল্পের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা যায় নি—সেরূপ ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা হয় নি। তাই পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই বলেছেন, "তৃতীয় পরিকল্পনার অনেক কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় টানতে হবে।" ব্যক্তিক্ষেত্রে দেখি, সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বহু বিচিত্র রকমের ভোগ্যদ্রব্যের ও হাল্কা ধরনের শিল্পের পত্তন হয়েছে। বাসগৃহ, আমোদপ্রমোদ এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অসংখ্য আধুনিক কায়দায় সৌখিন বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সৌন্দর্যমণ্ডিত অট্টালিকা নির্মাণ, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ও গাড়ি তৈরি প্রভৃতি অর্থনীতিক ক্রিয়া-কর্মের প্রসারের দরুণ আর্থনীতিক কাঠামোর তৃতীয় ধাপের অভূতপূর্ব বিকাশ ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের আর্থনীতিক জীবনে এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বড় বড় শহর নগর এলাকায় দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলি এই ধরনের শিল্পের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ যাতে প্রকৃত উন্নয়নের হার দ্রুত হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে শিল্পায়নের কার্যক্রম, উপকরণের অপচয়, অপব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষে অব্যবহারের রূপেই প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া, তৃতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে এবং এর পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার মোট সঙ্গতির এক-তৃতীয়াংশ। আর ঐ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনের পরিমাণ ৫৭৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে ৩৭০০ কোটি টাকা রপ্তানী বাণিজ্য থেকে আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে গড়ে বার্ষিক রপ্তানীর তুলনায় প্রতি বৎসর ৭৩ কোটি টাকা অধিক রপ্তানী হবে এই আশায় এই

হিসেব কষা হয়েছে। কিন্তু রপ্তানীর এতটা বৃদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থাতেই সম্ভব কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। তার উপর, এই বৎসর থেকে বৃটেনের ইওরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের ফলে স্বাভাবিক পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ২৭·৫ ভাগ বৃটেনের সঙ্গে। কমনওয়েল্থভুক্ত দেশ হিসেবে শুল্কের ব্যাপারে আমরা এতদিন যে সব সুযোগ সুবিধে ভোগ করেছি তা এবার হ্রাস পাবে—কাজেই রপ্তানী থেকে পাওনা হ্রাসের দরুণ বৈদেশিক মুদ্রা সংকট নিঃসন্দেহে তীব্রতর হবে। আমরা স্ব-নির্ভরশীল নিয়মের পর্যায় থেকে কত দূরে আছি তা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের আজও অসহায় ও অস্বাভাবিকভাবে নির্ভরশীলতা থেকে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়।

আবার দেখি পরিকল্পনামূলক আর্থনীতিক কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আমাদের তার প্রত্যেকটিই অনুপস্থিত। যেমন, ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের যথার্থ উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, বৃহৎ ব্যক্তিগত ফাটকাদারী ও শেয়ার ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দেশের আর্থনীতিক সম্পদ উদ্ধারের ব্যবস্থা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণমূলক কোনো ব্যবস্থাও আমাদের পরিকল্পনায় আজ পর্যন্ত স্থান পেল না। অথচ সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থকতার অন্যতম সর্ত প্রধান প্রধান পণ্য ও আয়ের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা। আর তা না করা হলে, ব্যক্তি-মালিকানা পরিচালিত মূল্যনীতির মাধ্যমে জাতীয় আয় ও বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক রসদ এমনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টিত হবে যে তাতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিলাসদ্রব্যমূলক ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে উন্নয়নের পক্ষে বাঞ্ছিত মূল্যস্তর রক্ষা করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী শিল্প-গোষ্ঠীর স্বার্থানুযায়ী মূল্যস্তরে যে পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন তা ঘটছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গ্যাডগিল লিখেছিলেন: A great number of policy decisions and even more their absence in relation to Indian Planning can only be explained reasonably in the light of interest of classes or groups in power. The deliberate shally-shalling about food policy has no meaning except as

arising out of desire to protect the threaded interests of the rural money-lender, trader and grain wholesaller who even today form an important part of the Indian capitalist class. In the same way, the foregn exchange debacle of 1956-57, the continuance of *adhoc* licensing policies for export and import quotas with large speculative gains which they flagrantly make possible, the twofold misdirection of plan involved in the special licensing of imports of industrial capital goods and materials in the supposed interests of promotion of exports, all these appear related to more closely to profits of private groups than to national development policy.

উপরের বিশ্লেষণ থেকে আমাদের পরিকল্পনার সংকট সহজেই চোখে পড়ে এবং এই সংকট যে প্রচলিত আর্থনীতিক কাঠামোপ্রসূত, তাও পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, ক্রমশই যে পরিকল্পনার পরিধি সীমিত ও সংকুচিত হয়ে আসবে—তার লক্ষণও এখনই ফুটে উঠেছে বিভিন্ন দিক থেকে। এই সংকটের উৎস হলো, বিশেষ করে কৃষি ও বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্ক বজায় রেখে অধিকতর ক্ষমতাশালী ও ব্যাপকতর ব্যক্তিক্ষেত্র-প্রধান আর্থনীতিক কাঠামোয় সীমিত রাষ্ট্রীয় মালিকানা। বিপুল ও বর্ধমান জনসংখ্যাসংবলিত অনুন্নত আর্থনীতিক কাঠামোয় এই পদ্ধতি সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়নের পরিবর্তে এই সব দেশের বিলম্বিত দুর্বল ধনিকশ্রেণীর পুষ্টির সহায়ক হয়। ভারতবর্ষের গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। কাজেই সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে আমাদের নতুন করে ভাববার দিন এসেছে।

ডাকবাংলার ডায়রি

সুবচনী

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

সুন্দরবনে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। ফিরলাম কোলাঘাট থেকে। শুনলে লোকে হাসবে।

যখন মোমিনপুরের মোড়ে বাস ধরব বলে দাঁড়ালাম তখন গরমের ঠিক-দুপুর। গলা পিচের ওপর ঠিক্‌রে পড়ছে রোদ। চোখ চাওয়া যাচ্ছে না। মোমিনপুরের আকাশকেও বলিহারি। আকাশ তো নয় যেন আদেখলের ঘটি। ৭৬ নং বাসটাও এলো রোদ্দুরে বেজায় মাথা গরম ক'রে। যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সেখান থেকে বাস বদলে কাকদ্বীপ।

বাসের যাত্রীদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ রোদ্দুরে সবাই বেরিয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে। কেউ রুগীর জন্যে ওষুধ কিনতে, কেউ সওদা করতে, কেউ মামলা লড়তে শহরে এসেছিল। গাঁয়ের তালেবর লোকগুলোকে দেখলেই চেনা যায়। দশ আঙুলে আংটি, কিন্তু কাপড়টা ঠিক হাঁটুর ওপর তোলা। যেসব গঞ্জ-মতো জায়গায় বাস বেশীক্ষণ থামে, সেখানে ডাব নিয়ে দরাদরি করবে, তারপর গজর গজর করতে করতে ডিবে থেকে বিড়ি বার করে উল্টোমুখে বারকয়েক ফুঁকে ধরাবে।

একটা লোক আমার ঠিক পাশেই সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসে ছিল। খানিকক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে একটু রুক্ষভাবেই বললাম পাটা নামিয়ে নিতে। লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে পাটা নামিয়ে আধতোলা করে থাকল। প্রথমটা বুঝিনি, খালি পা মেঝেয় ছোঁয়াতেই তার পা তোলার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঝেটা তেতে আগুন হয়ে আছে। আর আমার পাশের লোকটির পায়ে জুতো নেই।

বেলাবেলি কাকদ্বীপে পৌছুবে বলেই এমন ঠিকদুপুরে বাড়ি থেকে বেরুনো। বেলাবেলি। কাকদ্বীপে পৌছুনো। আশ্চর্য। বছর পনেরো আগেও কথাটা

কেউ ভাবতে পারত না। কাকদ্বীপ তখন ছিল অনেক দূরের রাস্তা। নৌকোয় করে ছাড়া যাওয়াই যেত না। আসতে যেতে জোয়ার-ভাঁটার জন্যে বসে থাকতে হত। শহরবন্দরে রাতটুকু অপেক্ষা করতে গিয়ে কত যে সব বিশ্রী বিশ্রী রোগ হতো। খালের ওপর পুল আর সটান পাকা রাস্তা হওয়া অব্দি কাকদ্বীপ তো এখন কলকাতার কোলের কাছে চলে এসেছে। ঘড়ি ঘড়ি বাস। এখন হুস্ করে গিয়ে হুস্ করে চলে আসা যায়।

আমতলা ছাড়াবার পর পেছনের একটা বাস হুস্ করে এগিয়ে যেতে একটা কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল। রাস্তা এমন কিছু চওড়া নয়। পাশে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি, নাহলে খাদ। আমাদের বাসের ড্রাইভারের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে সামনের বাসটাকে পেছনে ফেলতে হবে। বাসের অমন স্পীড জন্মে দেখিনি। রীতিমত ভয় করতে লাগল। সামনের বাসটা রাস্তা আটকে আটকে চলেছে। একটা গরুর গাড়ি সামনে পড়ায় আগের বাসটা যখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের বাসটা পাশের গড়ান জমিতে কাত হয়ে কিভাবে যে এগিয়ে গেল সে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। ড্রাইভারের ওপর কি রাগ যে হচ্ছিল বলবার নয়। এতগুলো মানুষের (বিশেষ করে আমার) জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবার কী অধিকার আছে তার? আগের বাসটাকে পিছিয়ে পড়ে যেতে দেখে খানিক পরে আবার ভালও লাগল। মোট কথা, প্রাণ হাতে করে শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে গেলাম।

কাকদ্বীপের বাস ছাড়তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সেই ফাঁকে গঙ্গার ধারটা ঘুরে এলাম।

গঙ্গা না বলে হুগলী বললেই ঠিক বলা হয়। নাম যাইহোক, নদী এখানে প্রকাণ্ড চওড়া। মাঝগাঙের নৌকোগুলো এইটুকু এইটুকু দেখাচ্ছিল। পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। ছেলেবেলার কতকগুলো ধারণা থাকে, বড় হয়েও মন থেকে কিছুতে যেতে চায় না। ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্র আছে, এ কথাটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বন্ধুবান্ধবেরা গাড়ি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে যেত ফুর্তি করতে, বোধহয় তাদের কাছ থেকে শুনে থাকব। খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে থাকত আমার এক ইস্কুলের বন্ধু। তাদের ছিল লোহালক্কড়ের ব্যবসা। গরমের সময় দু-চারদিন তাদের গাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে গিয়েছি। তাদের মুখ

থেকে শুনতাম দক্ষিণের হাওয়া আসে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ময়দানে তখন ফেরি করে তপ্‌সে মাছ বিক্রি হত। শুনতাম তপ্‌সে মাছ নাকি মাছের রাজা। সাহেবসুবোরা খায়। এই তপ্‌সে মাছও নাকি ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্র থেকে আসে। আর যুদ্ধের সময় জাপানী গুপ্তচররা বঙ্গোপসাগর থেকে তো সটান ডায়মণ্ডহারবারেই নেমেছিল। আসলে মানচিত্রে যাই থাক মনে মনে আমরা বরাবরই সমুদ্রকে ডায়মণ্ডহারবারের কোলে বসিয়ে এসেছি।

এককালে বাইরের জাহাজগুলো আসতে যেতে ডায়মণ্ডহারবারেই নঙ্গর ফেলত। সে আজ দেড়শো বছরেরও আগের কথা। আসতে মাল খালাস আর যেতে মাল তোলার কাজ প্রধানত এখানেই হতো। তখন এখানে ছিল সারবন্দী মালগুদাম। গ্রামে খাবারদাবার জিনিসপত্র মিলত। পাশেই ছিল সাহেবসুবোদের কবরখানা। ডায়মণ্ডহারবার ছিল তখন খুব এক ফুর্তির জায়গা। দমদম নিয়ে পুরনো একটা গান আছে না:

দেখো মেরি জান
কোম্পানি নিশান।
বিবি গিয়া দমদমা
উড়ি হ্যায় নিশান।
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব
বাঁকা কাপ্তান,
দেখো মেরি জান,
লিয়া হ্যায় নিশান।

এ গান সে সময়ে ডায়মণ্ডহারবার সম্পর্কে খাটত।

জলপথে ডায়মণ্ডহারবার উনপঞ্চাশ মাইল হলেও, গাড়ির রাস্তায় বত্রিশ আর ট্রেনে আটত্রিশ মাইল। এককালে যে ডায়মণ্ডহারবারের নাম ছিল হাজিপুর, সে কথাটা লোকে এখন ভুলেই গেছে।

ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে কাকদ্বীপের বাস ছাড়ল। পুলটা পার হতেই দেখলাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে লোকে কী সব দেখছে। 'এইখেনে হ্যা, এইখেনে'—কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। পরে শুনলাম আগের দিন একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা লরি খালে পড়ে গিয়েছিল। জল থেকে লাস তোলা হয়েছে আজ সকালে।

বেশ কিছুক্ষণ সারা বাস থমথম করতে লাগল।

বাইরে পড়ন্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠ। মাঝে মাঝে বেড়া-দেওয়া উঁচু উঁচু ভাঙা জমি। বেড়ার গায়ে ঘুর ঘুর করছে ছাগল। এক জায়গায় মাঠের মধ্যিখানে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

এ রাস্তায় আগেও একবার এসেছিলাম। বাস তখনও চলতে আরম্ভ করেনি। তখন এ রাস্তায় যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ট্যাক্সি। শুধু ট্যাক্সি বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বিশ্বম্ভর ট্যাক্সি। যেখানে গায়ে গা দিয়ে ছ-জনের বসবার জায়গা হয়, সেখানে যে কেমন করে ভেতর-বাইরে তিরিশ চল্লিশটা লোক এঁটে গেল না দেখলে বিশ্বাস হতো না। ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কথা মনে আছে। সারা রাস্তা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গিয়েছিলাম। লোকটা ছিল নেপালী। কিন্তু দখ্নো ভাষা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। স্বভাবটা ভারি মিষ্টি। গালের ওপর প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ। যুদ্ধের সময় মিলিটারিতে ট্রাক চালাত। কোহিমার কাছে এক পাহাড়ে বাঁক নিতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। কী করে যে বেঁচে গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য। মিলিটারি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পেটের ধান্ধায় অনেক জায়গায় ঘুরেছে। বছর দুই দেশে যায়নি। ছোট মেয়েটার জন্যে মন কেমন করে। বাস হওয়ার পর থেকে এ রাস্তায় ট্যাক্সির আর কদর নেই। কোথায় গেল সেই লোকটা ?

মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামারি, কুল্পি, ট্যাংরার চড়া, করঞ্জলি পেরিয়ে সন্ধ্যে হব-হব সময়ে কাকদ্বীপে পৌছুলাম। সামনে নামখানার বাস দাঁড়িয়ে। বনবিভাগের আপিস নামখানায়। যেতে কতক্ষণ লাগে, কত ভাড়া, সব জেনে নিলাম।

বাসস্টপ থেকে ডায়নামোর ভটর ভটর আওয়াজ শুনছিলাম। বুঝলাম এ আওয়াজ বরাবর গেলেই কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপ পেয়ে যাব। কদিন ওখানেই আস্তানা গাড়া যাবে। তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় যাব।

সম্মেলনে বিস্তর চেনা লোক মিলে গেল। সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছে। আমার মতো রবাহূতের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। যাদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেছিলাম তাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সভা, মিছিল, সম্মেলনে যাওয়ার মধ্যেও একটা নেশা আছে। না যেতে পারলে মন খুঁতখুঁত করে। অথচ বক্তৃতা হলে যে মন দিয়ে শুনি, তা মোটেই নয়। আসলে

নেশা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া। একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া। দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কথার তুব্ড়ি ছোটানো। কাজ কিছু হয় না। কিন্তু মন হাল্কা হয়।

কাকদ্বীপে এই আমার প্রথম রাত কাটানো। হাটতলার কাছে একটা ছিটেবেড়ার ঘরে আমরা শোবার জায়গা পেয়েছিলাম। আলো ছিল না। মাটির মেঝেতে ঢালাও মাদুর। ঝোলাটাকে বালিশ করে শুলাম। শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প। বেশির ভাগই চেনা মানুষদের খোঁজখবর নেওয়া। অমুক এখন কী করছে ? সে কী ! দালাল হয়ে গেছে। ভাবাই যায় না। কী গরম গরম কথা বলত সে। শুনলে ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ জীবনে এমন তো আকছার ঘটছে। খুব ভাব ছিল, এমনও কেউ কেউ ছিট্‌কে গেছে। দূরের স্বপ্নটা হঠাৎ মুছে গিয়ে সুখে থাকার চিন্তাটা নাকের ডগায় চলে আসে। তারা হাতে হাতে কিছু পেলেও হারায়ও অনেক। নইলে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না কেন ? দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালায় কেন ?

সকালে সম্মেলনে বসে নানা জেলার অবস্থা শুনলাম। চাষীর হাত থেকে অচাষীর হাতে জমি চলে যাচ্ছে। বেনামে জমি রেখে সিলিংকে কলা দেখানো হচ্ছে। নালিশ করেও সুবিচার নেই। এ অবস্থা বেশীদিন চললে লোকে মরীয়া হয়ে উঠবে। সমস্যা যেমন জটিল, লড়াইও তেমনি জটিল। সোজা রাস্তায় হবার নয়। সমিতিতে সবাইকে জড়ো করতে না পারলে এর বিহিত হওয়াও শক্ত।

ফ্রেজারগঞ্জের একজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে দেখা।

যাকে আমরা ফ্রেজারগঞ্জ বলি, তার স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। ফ্রেজার-গঞ্জের গায়েই বঙ্গোপসাগর। জায়গাটা সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার খবর নেওয়া ছিল : দেড়শো বছর আগে বাংলার ছোট লাট সার এণ্ড ফ্রেজার এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলবার। লোকে এসে এখানে যাতে বসবাস করতে পারে তার জন্যে মাটি ফেলা আর জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া রাস্তাঘাট আর বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল। নারায়ণতলা জায়গাটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। দক্ষিণে ধু ধু করছে বালিয়াড়ি তারপর সমুদ্র। উত্তরে আর পশ্চিমে পাত্তিবুনিয়া খাল। পূবে সপ্তরমুখী নদী আর পুকুরবেড়িয়া

খাল। দুই বালির পাহাড়ের মাঝখানে মিষ্টিজলের প্রকাণ্ড ঝিল। কিন্তু ফ্রেজারসাহেবের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। বহু টাকা ঢালবার পর বোঝা গেল খরচে পোষাবে না। জঙ্গল পরিষ্কার আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই সময় কিছু বাড়ির ভিত পাওয়া গিয়াছিল, ভিতগুলোর কাছেই ছিল তেঁতুল আর মনসা গাছ। তাছাড়া এ জায়গার দক্ষিণপূবে পাওয়া গিয়েছিল চারটে ইঁটখোলার চিহ্ন আর কিছু ছড়ানো ইঁট। আগে কোনো এক সময়ে এখানে যে লোকালয় ছিল তাতে সন্দেহ থাকেনি।

সুতরাং ও অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই আমার ঘোরবার সাধ। কিন্তু ফ্রেজারগঞ্জের লোকটি বললেন, 'সুন্দরবনে এখন যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। খালবিল সব এখন শুকনো। কোথাও ঘুরতে পারবেন না। সুন্দরবনে ঘোরবার সময় হলো বর্ষা, নৌকোয় করে তখন যেখানে খুশী যত দূরে খুশী যেতে পারবেন।'

শুনে খুব দমে গেলাম। আসবার সময় সবাইকেই বলে এসেছি সুন্দরবনে যাচ্ছি। সুন্দরবনে যাওয়া মানেই তো প্রায় ডোরাকাটা বাঘের সামনে পড়া। ফিরে গিয়ে জায়গাবিশেষে খানিকটা বানিয়ে না বললেও তো মান থাকবে না। কাজেই সুন্দরবনের একটা মোটামুটি চেহারা পাঁচমুখে জেনে নিতে হলো।

যা শুনলাম তাতে সুন্দরবন খুব একটা সুন্দর জায়গা ব'লে বোধ হলো না। আসলে ভাটির দেশ। চারিদিকে শুধু সরুমোটা নদী, খাল, খাঁড়ি, জলা আর চড়া। কোনো চরে শুধুই জলকাদা, ছোট ছোট গাছ আগাছার জঙ্গল। উত্তরের যেসব চরে বাঁধ আছে, সেখানে ভালো ধান হয়। সুন্দরবনের বন বলতে একটানা ছোট গাছের জঙ্গল। বড়ো গাছ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুটের চেয়ে লম্বা গাছ খুব কমই আছে। আগে যদি কোথাও বন হাসিল করা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দেখা যাবে এখন খুব ভালো বড়ো গাছ হয়েছে। জঙ্গল ঘন আর মাটি নোনা বলেই সুন্দরবনে গাছ ছোট। আগেকার হাসিল করা জায়গায় আগাছা কম, বেতবন আর কাঁটাঝোপই বেশী। বর্ষার সময়েই যা গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। নদীর ধারে ধারে একরকমের হলুদ ফুলের গাছ হয়, যার ফুলগুলো ঝরে পড়লে রং হয় লাল। জোয়ারের জলে এই লাল লাল ফুল যখন ভেসে যায়, তখন তার ওপর রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখায়। আর আছে ঢোলা ঢোলা পাতাওয়ালা গোলপাতার গাছ। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে হয় সবুজ কেয়াগাছের ঝাড়। পাতাগুলো জলে নুয়ে পড়ে।

যেখানে কাকদ্বীপের বাসস্ট্যাণ্ড, তার পাশেই খালপুলের নীচে সারি সারি নৌকা বাঁধা রয়েছে কদিন থেকেই দেখছি। নৌকোর ওপর লাল রঙের নিশান দেখেই বোঝা যায় তারা সম্মেলনের লোক নিয়ে এসেছে। ওদের খাওয়া-থাকা সবই নৌকোয়।

সম্মেলন ভাঙবার দিন হঠাৎ একটা প্রস্তাব এসে গেল : 'যাবেন আমাদের সঙ্গে নৌকোয় মেদিনীপুর ?'

আমি তো তক্ষুনি রাজী। ঠিক হলো রাত দশটায় আমি যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে সটান নদীর ঘাটে চলে যাই। জোয়ারের মুখে হল্‌দিয়ার নৌকো ছাড়বে।

আমরা সবাই ঠিক সময়েই পারঘাটার মুখে এসে জড়ো হয়েছিলাম। খানিক পরে 'এসো গো' বলে খালের মুখে হাঁক শোনা গেল। অন্য সকলের দেখাদেখি আমিও ছুটলাম খানিকটা যাওয়ার পরই জুতো খুলতে হলো। বেজায় কাদা। নৌকোর কাছে প্রায় হাঁটুজল। অত কাণ্ডকারখানা ক'রে যাওয়ার পর শুনলাম নৌকো ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। সামনে একজনের হাতে হারিকেন। সামনে সমস্তই ছায়া ছায়া। অনেকক্ষণ কাদাজলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কে একজন বলল, 'এসব জলে বড় কাউট, ডাঙায় ওঠো হে, হ্যাঁ—।'

নৌকো ছাড়ার ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। ঘাটে চাঁদের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। দলের একজনই আমার চেনা। তাকেও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। একজনদের মনে হলো আমাদেরই দলের। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে এসে উঠলাম তার পাশেই লঞ্চ ষ্টিমারের জেটি। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। আঁশটে গন্ধে বেশ বুঝলাম এটা মাছ-ওঠার ঘাট। আবছা অন্ধকারে মাছের খালি চুপ্‌ড়িগুলো এতক্ষণে ঠাহর করতে পারলাম। যে দলটাকে ছেড়ে এসেছিলাম ফিরে গিয়ে তাদের পাশেই একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসলাম। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বারান্দায় আমি একা। দলের সবাই উঠে চলে গিয়েছে। ভারি রাগ হলো। আমি তো এখানেই ছিলাম, ডাকল না কেন ? উঠে এখন যাবই বা কোথায়। রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দিই। তারপর সকালে উঠে বাড়ির ছেলে বাড়ি।

রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

'হল্‌দিয়া যাবে গো, হল্‌দিয়া।' তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলাম। আমি তো হল্‌দিয়াতেই যাব। জুতোজোড়া হাতে নিয়েই থালমুখে ছুটলাম। কাদার ভেতর দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে নৌকোর কাছে গেলাম। নৌকোর মাথার ওপর থেকে একজনের গলা পেলাম। 'আসুন, আসুন—থপ্‌ ক'রে আসুন। ছিলেন কোথায় এতবেলা? আমি তো ভাবতেছিলাম আর এলেন না।' দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। চোখে ভালো ক'রে ঠাহর হচ্ছিল না। ওঠবার পর বুঝলাম নৌকোটা প্রায় একতলা সমান উঁচু।

নৌকো যখন ছাড়ল, তখনও অন্ধকার। ঘাটের যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। হাওয়ায় রীতিমত শীত-শীত করতে লাগল। ডানদিকের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। এবার আমরা উত্তরমুখো চলেছি। আরো খানিকক্ষণ পর আলো যখন আরো স্পষ্ট হলো, তখন চেয়ে দেখলাম কোনো দিকে কোথাও মাটির কোনো চিহ্ন নেই। জলের এতবড় ঢেউ জন্মে দেখিনি। কোথায় এসে পড়লাম? এ নদী, না সমুদ্র? নদীতে এত উঁচু ঢেউ হয়? এতক্ষণে পুরো নৌকোটা নজরে পড়ল। একে বলে বোটনৌকো। এ নৌকোয় করে লোকে সাগরে যায়। পালে পুরো হাওয়া লাগছে। নৌকো চলেছে সাঁই সাঁই করে। একটা ধার একেবারে কাত হয়ে গেছে। আমরা সেইদিকটায় বসে। ঢেউয়ের ফেনাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে গায়ে এসে লাগছে। জলে গড়িয়ে পড়ার ভয়ে মাঝে মাঝে উঠে বসতে হচ্ছিল। নৌকোর মাঝখানটায় হঠাৎ একটা খোদল চোখে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখলাম সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। একজন লোক ওপর থেকে উঠে সেই সিঁড়ি দিয়ে খোলের মধ্যে নেমে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম খোলের মধ্যে কে একজন বমি করছে। নৌকোর দুলুনিতে যাদের গা পাকিয়ে ওঠে, শুনলাম তারা খোলের মধ্যে বসে যায়।

ঢেউয়ের ছিটে আর ঝিরঝিরে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমার বেশ ভালো লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো? গঙ্গা সেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর

আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মণ্ড-হারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহানাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুড়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহানা। লোকে বলে মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্র পড়ে।

সাগরদ্বীপের কথা বলতে বলতে ছেলেটা মজনতালি সঈফের গল্প বলল। মজনতালি সঈফ গঙ্গাসাগরের এক পীর। একদিন নাপিতের কাছে খেউরি করতে করতে পীর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। নাপিত তো খুর হাতে নিয়ে বসেই আছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে পীর এসে হাজির হলো। গা দিয়ে তার দর দর করে ঘাম ঝরছে। নাপিত জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে কোথায়? পীর বলল, চড়ায় আটকে গিয়েছিল জাহাজ; খালাসীরা তাই ডেকেছিল। কী আর করি, টানতে টানতে জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। নাপিত কিন্তু পীরের কথা বিশ্বাস করেনি। ফলে, তার কী শাস্তি হলো জানেন? সেইদিনই সে আর তার বাড়ির সবাই শিঙে ফুঁকল। বলে ছেলেটা হো হো করে হাসতে লাগল।

কিন্তু তার পরের প্রশ্নটা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম।

'পাতালে এক ঋতু' পড়েছেন আপনি?' পড়িনি শুনে খুব অবাক হলো। বলল, দীপকবাবু আমাদের ওদিকে এসেছিলেন একবার একটা মিটিঙে। আমার সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছিল।

খানিকক্ষণ কথা বলেই বুঝলাম হালের কোনো উপন্যাসই তার না পড়া নয়।

মাঝে মাঝে একেকটা-চর যায় আর ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, বুঝলেন এটা ঘোড়ামারার চর, এটা লোহাচর। কোনো কোনো চরে নাকি পোস্টাপিস আছে, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক আছে, তাও ওর মুখ থেকেই শুনলাম।

যেতে যেতে আকাশে রোদ বেশ ভালোভাবেই উঠে গেল। কিন্তু জলো হাওয়া থাকায় একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। সামনে একঘেয়ে জল নেই আর। দু-পা গেলেই একটা ক'রে চর। জেমস্‌ অ্যাণ্ড মেরী চড়ার নাম শোনেন নি।

বহুকাল আগে সেই চড়ায় আট্‌কে একটা জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজটার নাম ছিল রয়াল জেমস্ অ্যাণ্ড মেরী।

ডেকে দেখাল বাঁদিকে হল্‌দি এসে হুগলীতে পড়েছে। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতে দেখতে হল্‌দিয়া এসে গেল। নতুন বন্দর হচ্ছে হল্‌দিয়ায়। চারদিকে তার তোড়জোড়ের চিহ্ন। নদীর বেশ খানিকটা ভেতরে জেটি। জলের ওপর বড় বড় বয়া ভাসছে।

ডাঙায় নেমে অনেকের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হলো।

বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। আমরা যাব রাণীচক। সন্দিয়ার চক হয়ে দক্ষিণ রাণীচকে যখন পৌছলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। এ গাঁয়ে থাকে পতিতদার এক মামাতো ভাই। ভুবন জানা। চায়ের জন্য তখন মরে যাচ্ছি। ভুবন জানার মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দুধচিঁড়ে খাইয়ে ছাড়লেন।

গাঁয়ে যার সঙ্গেই কথা বলি এক কথা। হল্‌দিয়ার বন্দর হবে। আটষট্টিটা মৌজার ওপর নোটিশ হয়েছে উঠে যেতে হবে। আস্তে আস্তে রাস্তায় যতটা চোখ পড়ল, মনে হলো এদিকটায় বসতি খুব ঘন। দক্ষিণ রাণীচকে দুশো ঘর লোকের বাস। পাঁচমিশেলী গ্রাম। পাঁচভাগের একভাগ মুসলমান। পঞ্চাশ ঘর ধোপা। একঘরই শুধু কাপড় কাচে। বাকি সবাই ঘরগেরস্তি করে। জাতব্যবসার পুরনো পরিচয়টাও এখন আর তারা দিতে চায় না। নিজেদের তন্তুবায় বলে। বলে, শুক্‌নি তাঁতী।

ব্রাহ্মণ আছে তিন ঘর। চাষবাস করেই খায়। তবে একটু নল্‌চে আড়াল করার ব্যাপার আছে। তাই জমিতে লাঙল দেওয়ার কাজটা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেয়। বাকি সবই—ধান রোয়া, ধান কাটা—নিজেরাই করে। তাছাড়া গ্রামে পুজো-পার্বণ বিয়েশ্রাদ্ধে টাকাটা সিকিটা মেলে।

দু-ঘর নাপিত আছে, তাদেরও উপজীবিকা চাষবাস।

গ্রামের আর যারা, তারা সবাই মাহিষ্য। কৈবর্ত কথাটা অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এদিকের গোটা তল্লাটই মাহিষ্যপ্রধান। চাষবাসই তাদের জাতের জীবিকা।

জীবিকা চাষ হলে হবে কি, গ্রামের প্রায় অর্ধেকই জমিহীন ক্ষেতমজুর। নিজেদের বাস্তুটুকুই তাদের সম্বল। আর যারা, তাদের বেশির ভাগই ভাগচাষী।

ঘর পিছু একশো পঁচিশ থেকে একশো ত্রিশ একর জমি আছে, এমন

জোতদার আছে গ্রামে তিন ঘর। আর আছে দু-ঘর রায়তচাষী। তাদের দু-এক একর করে নিজস্ব জমি আছে। অভাব-অভিযোগ থাকলেও তারা ভাগে চাষ করে না। দায়েআদায়ে ধারদেনা হায়হাবালত করে চালায়। ভাগচাষীদের মধ্যে বারোআনা অংশের কিছুটা রায়তজমি, কিছুটা ভাগচাষ। অন্যদের ছিটেফোঁটাও জমি নেই। মুসলমানপাড়ার দশ আনা লোক দিনমজুরি ক্ষেতমজুরি করে পেট চালায়। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো। নামগুলো এখনও মনে আছে: শেখ তালেব, শেখ দেবু, শেখ কানাই, শেখ এক্কার, শেখ রাখাল।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম রাণীচক থেকে। রাতটুকু রত্নার চকে থেকে সকালবেলায় রওনা দেব। রত্নার চকে পৌছে দিতে সঙ্গে এল গুণধর। মাঝখানে অনেকগুলো গ্রাম। সাউতান চক, হাতিবেড়ে, চক তাড়ুয়ান, বিশ্বনাথ দত্তের চক। তারপর রত্নার চক। কমখানি রাস্তা নয়। গোটা তল্লাটের ওপরই উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে।

মন্বন্তরের বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কিছুটা কিছুটা ঘুরেছিলাম। সে আমলে হিন্দু চাষীর বাড়িতে মুরগি পুষতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এবার দেখলাম ঘরে ঘরে মুরগির চাষ। কেউ কেউ আছে ডিম খায়, মাংস খায় না। কারো কারো দুটোই চলে। রাস্তায় কোনো চায়ের দোকান দেখলাম না। মুদির দোকান ময়রার দোকানও চোখে পড়ল না।

অনেকগুলো বাড়ির দেখলাম জীর্ণদশা। গুণধর বলল লোকে এখন আর বাড়িঘর সারাচ্ছে না। উঠেই যখন যেতে হবে তখন আর ডোবা পুকুর সংস্কার করিয়ে, ঘরবাড়ি সারিয়ে কী লাভ? ফলে, ঘরামীরা ঠায় বসে। কেউ আর উলু কাটছে না। খড়েরও দাম পড়ে গেছে। সুতাহাটা থানার আটষট্টিটা মৌজা জুড়ে এখন একটা থমথমে ভাব। জমির ভালোমন্দ হিসেবে জমির দাম এখানে চার পাঁচশো টাকা থেকে হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘে। সে দর আর থাকছে না। হু হু করে পড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এই মওকায় জলের দরে জমি কেনবার মতলব ভাঁজছে। সরকার যে দরে জমি নেবে সে দরটা অবশ্য সুবিধের নয়। তিন বছরে শোধ করার শর্তে বিঘে পিছু তিনশো টাকা। যাঁদের জমি আছে, তারা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। উঠে তো যেতে হবেই। কিন্তু যাবে কোথায়? ও দামে এমন জমিই বা পাবে কোথায়? তারওপর মানুষের ভিটে বলে কথা।

বাপদাদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই ভিটেমাটিতে। কেউ কেউ গ্রামের মায়া কাটিয়ে আগেভাগে কোথাও ভালো জমিজায়গা দেখে উঠে যাচ্ছে। এর পরে সে-সব জায়গার জমির দর আরও বেড়ে যাবে। যারা থেকে যাচ্ছে তারা উপায় নেই বলেই থাকছে। নতুন জায়গায় গিয়েই কি শান্তি আছে? জমি হলেই তো হয় না। এ জমির সঙ্গে কতদিনের চেনাজানা। এইটুকু বয়েস থেকে। নতুন জমির ভাবগতিক বুঝতে, তার সঙ্গে ভাব করতেই তো ঢের দিন যাবে। পাড়াপড়শী সবই হবে নতুন। এ তো উঠে যাওয়া নয়, একেবারে যাকে বলে জলে-পড়া।

এ অঞ্চলের ছেলের বাপদের হয়েছে আরেক মুস্কিল। বিয়ের বাজারে ছেলের দর সাংঘাতিক পড়ে গেছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে যারা মেয়ের বিয়ের দেনা শুধবে ভেবেছিল, তাদের এখন মহা অশান্তি। তার ওপর উঠন্ত সংসারে মেয়ে দিতেও মেয়ের বাপেরা এখন কিন্তু-কিন্তু করছে।

কথা বলতে বলতে যখন রত্নার চকে এসে পৌছলাম, বাড়িতে বাড়িতে তখন সন্ধ্যে জ্বলে গেছে। সটান উঠলাম শ্রীহরি দিন্দার বাড়ি। উঠোনে আমকাঁঠালের গাছ। মাচার ওপর লতানো লাউগাছ। তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে।

রত্নার চক গ্রাম খুব বড়ো নয়। মোট বিয়াল্লিশ ঘর লোক। দু-পাঁচ ঘর ক্ষেতমজুর; থাকার মধ্যে শুধু বাস্তু। এক ঘর রায়তচাষী, তাদের বিঘে চল্লিশ জমি। বাকি সবাই ভাগচাষী। পীতাম্বর চকের বেরা আর পাড়ুইদের জমি তারা ভাগে করে। ছ-সাত ঘর বাগ্দী, এক ঘর বামুন, দু ঘর করণ; বাকি সবাই মাহিষ্য।

এদিককার গাঁয়ের অবস্থা আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে ভালো। আগে যাদের বছরে ন-মাস উপোষ করতে হতো, এখন তারা বছরে ন-মাস দু মুঠো খেতে পায়। আগে বেশির ভাগ বাড়িতেই চৈত্র বৈশাখেই খোরাকি ফুরিয়ে যেত। তখন তারা দাদন আনতে যেত বেরাদের বাড়িতে। বেরারাও সেই মওকায় তাদের বেগার খাটিয়ে নিত—ঘাস নিড়ানো, জ্বালানির কাঠ চেলা করার কাজ করিয়ে নিত। দাদন একবারে দিত না। ঘোরাত।

বছর পনেরো ষোল আগে এখানে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্মগোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।

ধর্মগোলা থেকে ধান নেবার সাধারণ নিয়ম হলো, এক মণ ধান নিলে একমণ দশ সের ফিরিয়ে দিতে দিতে হবে। তবে ফসল ভালো না হলে সুদ মাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলটা শুধতেই হবে। তাছাড়া ধর্মগোলার হাতে আছে নগদ এক হাজার টাকা। এই টাকা মাসে টাকায় এক পয়সা সুদে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয়। টাকাটা ওঠে এইভাবে: ন টাকা আর ছেলের বিয়ে হলে, মেয়ের বিয়ে হলে এক টাকা গ্রামকে মান্য দিতে হয়—তাকে বলে 'বাপ' দেওয়া। বাইরের বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষকেই এ টাকা দিতে হয়। তাছাড়া গ্রামে যে বিচার-আচার হয়, তাতে যে জরিমানার টাকা ওঠে, তাও এই ধর্মগোলার তহবিলেই জমা পড়ে। এ ধরনের ধর্মগোলা শুধু এই গাঁয়েই আছে।

শ্রীহরির বয়স বেশি নয়। বছর পঁয়ত্রিশ হবে। চোখেমুখে বেশ একটা তাজা ভাব। বাপ মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই এখন শুধু বেঁচে। শ্রীহরি মেজো। দাদার তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে বিধবা বৌদি আছেন তাঁর এক মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। ছোট ভাইটা বছর চারেক আগে কলেরায় মারা যায়। ছোট ভাইবৌ আছে বাপের বাড়ির সংসারে। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বউ—এই নিয়ে এখন শ্রীহরির সংসার। নিজের আছে তিন বিঘে আর ভাগে বিঘে চারেক জমি। তাইতে কোনোরকমে বছরের খোরাক হয়ে যায়। দুটো আছে হালগরু, দুটো গাইগরু আর দুটো বাছুর।

বাড়িতে লোক এসেছে শুনে পাশের বাড়ি থেকে এলেন শ্রীহরির জ্যেঠিমা প্রভাবতী দিন্দা। বিধবা মানুষ। বয়স কম। মেয়েদের নিয়ে সমিতি করেছেন। ঐ সব নিয়েই থাকেন। লেখাপড়া জানেন না বলে খুব দুঃখ। পড়বেন বলে একবার বইও কিনেছিলেন। পড়ানো দূরে থাক, সবাই এমন ঠাট্টা শুরু করে দিল যে বইখাতা কুলুঙ্গিতেই তোলা থাকল। রাত্তিরে দল বেঁধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প হলো। গ্রামের লেখাপড়া নিয়ে।

রাণীচক গাঁয়ে এবার এই প্রথম কৃষকের ঘরের চারজন ছেলে বি, এ পাশ করেছে। গোটা থানায় আগে হাইস্কুল ছিল দুটি। একটা এখান থেকে বারো মাইল দূরে, আরেকটা আট মাইল দূরে। পঞ্চাশ একান্ন সাল পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা। এখন সেখানে পাঁচটা হাইস্কুল। সবচেয়ে কাছেরটা দু মাইল দূরে—ভবানীপুর গ্রামে। থানায় জুনিয়র হাইস্কুল তিনটি। দু এক বছর হলো হয়েছে। কাছেরটা মাইলখানেকের মধ্যে। সব চেয়ে দূরেরটা

এখান থেকে দশ মাইল। এই ইউনিয়নে ইউ, পি স্কুল চারটি। এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ ইস্কুলে পড়ে। এ পর্যন্ত এ গাঁয়ের মোটে একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সে এখন মহিষাদল কলেজে পড়ছে। বড় ভাই লেখাপড়া করেনি, চাষের কাজ করে। নিজেদের বিঘে তিনেক জমি, ভাগে নিয়েছে বিঘে পাঁচেক।

এ অঞ্চলে মেয়েদের ইস্কুল হয়েছিল পীতাম্বর চকে যুদ্ধের গোড়ার দিকে। ইউ. পি. ইস্কুল। একশো দেড়শো মেয়ে পড়ত। তিনজন মাষ্টারণী, একজন মাষ্টার। গিরীশ জোতদার ছিলেন সেক্রেটারি। তিনি ইংরিজি জানতেন না। ইস্কুলের পাকা বাড়ি হয়েছিল। কিন্তু সেক্রেটারি হওয়া নিয়ে এমন গোলমাল লাগল যে শেষ পর্যন্ত ইস্কুলই উঠে গেল। ইস্কুলের অমন সুন্দর পাকা বাড়িটা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। এখন মেয়েদের ইস্কুল থানায় তিনটি। তার মধ্যে দুটি হাই স্কুল আর একটি মাইনর। হাই স্কুল এখান থেকে আট মাইল আর মাইনর স্কুল তিন মাইল দূরে। সোলাট গ্রামের মাইনর স্কুলে এ গাঁয়ের মোটে একটি মেয়ে পড়ে। মেয়েটি বোর্ডিঙে থাকে। থাকা আর পড়ার কোনো খরচ নেই। খাওয়া বাবদ লাগে মাসে আধমণ চাল আর পাঁচটা করে টাকা।

সকালে উঠে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা আত্মীয় গ্রাম আর কদিন পর বাঙলা দেশ থেকে মুছে যাবে। ধর্মগোলাটা ভেঙে যাবে। মানুষগুলো এখানে সেখানে ছিটকে যাবে। শ্রীহরির সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, সে তেমন ঘাবড়ায়নি। সে বলল, দেখুন এই উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বুড়োদের সঙ্গে আমাদের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। বুড়োরা চাইছে অন্য কোথাও জমি জায়গা আর পারলে মোটা রকম খেসারত। আমরা চাইছি বন্দরে চাকরিবাকরি নিয়ে কিংবা স্বাধীন কোনো ব্যবসা ফেঁদে এখানেই থাকতে। আর কিছু না হোক, লরি চালানোটাও তো জোয়ান ছেলেরা শিখে নিতে পারবে।

তখন আমার বেরিয়ে পড়বার সময় হয়ে গেছে। জ্যেঠিমাকে ডেকে বিদায় নিলাম। জ্যেঠিমা বললেন, 'এখন তো আমরা পাখির মত কাঠি গুণছি। আবার এস।' শ্রীহরির কথাটা কিন্তু আমাকে সারা রাস্তা ভাবাল। রাস্তায় পড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজে ঘাড় তুললাম। দেখি গাছের ডালে একটা মাছরাঙা। তারপরই কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল।

নতুন রাস্তা হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে এসব জায়গা গমগম করবে। শীতের ক'টা মাস এখনই তো বাস চলে। রাস্তা হচ্ছে বলে বাস এখন বন্ধ। অনেকখানি রাস্তা এখন আমাকে হেঁটে যেতে হবে। ডায়মণ্ডহারবারের এপারে কোকড়াহাটি। তার আগে চৈতন্যপুর। সেখানে তমলুকের বাস মিলবে।

পড়িয়ার চক থেকে ফরেস্ট শুরু। ঝাউবনে ঝিরঝির করছে বাতাস। এ বনে ভাল কাঠ হয়। গাছ থাকায় নদীও পাড় ভাঙতে পারে না। তমলুক মহকুমায় বনবিভাগের ছ-টা আপিস! তার একটা বালুঘাটার বাজারে। একটু চা খেয়ে নিলাম। রাস্তার ধুলো তখনই তেতে উঠেছে। চর বাজিতপুরে এসে আর হাঁটা সম্ভব হল না। পকেটের অবস্থা সুবিধের নয়। খানিকটা বেপরোয়া হয়েই শেষ পথটুকু সাইকেল রিক্সা নিতে হল। তারপর চৈতন্যপুর থেকে বাস।

ঠিকানাটা আগেই নেওয়া ছিল। মেছেদায় এসে নৌকোয় আলাপ হওয়া ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে বেশি বেগ পেতে হল না। পানের বরজ থেকে তাকে ডেকে আনা হল। চা জলখাবার না খাইয়ে ছাড়ল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এলাম। সাহিত্য নিয়ে নানান কথা হলো। বললো এখনও লেখবার কথা কিছু ভাবেনি। তবে কোনোদিন হয়ত লিখতেও পারে।

স্টেশনের কাছেই পানের বাজার। মেছেদা থেকে রেলে গড়ে পাঁচশো কুড়ি পান দৈনিক চালান যায়। বেশির ভাগ যায় বাংলার বাইরে। বাকিটা কলকাতায়। মুখে মুখে হিসেব করে দেখলাম রোজ প্রায় লাখ চল্লিশেক পান এখান থেকে যায়। এ অঞ্চলে পান চাষের বয়স বেশি নয়। পান চাষ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চার নম্বর ইউনিয়নের চাটরা আর বল্লুক গ্রামে। সে আজ প্রায় একশো বছর আগে। শুধু পান চাষ করে এমন লোক কমই আছে। ধানপান দুটোরই চাষ করে বেশির ভাগ লোক। তবে পানই হলো প্রধান অর্থকরী ফসল। ঘন বসতি, জমি কম এবং পান বেচে টাকা বেশি পাওয়া যায়—তার জন্যেই পানচাষের দিকে এদিককার লোকের এত নজর।

বাঙলাদেশে মিঠে পান একমাত্র এখানেই হয়। মিঠে পান অবার বেলে মাটি ছাড়া হয় না। চাষে ডবলেরও বেশি খরচ। সারও দিতে হয় প্রচুর।

অগ্রাণ থেকে জষ্টি পর্যন্ত বিক্রি হয় গোড়া পান। বছরে প্রধান বিক্রি এই পান। তাছাড়াও বারো মাসই কিছু না কিছু পান কাটা আর বিক্রি হয়। পান বিক্রি হয় গোছ, শ আর হাজার হিসেবে। পঞ্চাশটা পান নিয়ে হয় এক গোছ। এখানকার চাষীরা পাইকারদের কাছে সেরা মিঠে পান বেচে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সে পান যায় বিকানীর, জয়পুর, যোধপুর, নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা, মুসৌরি। নিরেস পান বিক্রি হয় পনেরো টাকা হাজার। দর পড়ে গেলে কখনও কখনও সেরা পানও ঐ দরে বেচতে হয়। পানের টুকরি পিছু পাইকাররা পায় দু টাকা করে। গাছের মূল থেকে যেটা বেরোয়, সেটা খাড় পান—ভাল পান। আর ভাল পানের গোড়া থেকে ফ্যাকড়া বেরিয়ে সরু বোঁটায় এক সঙ্গে তিনটে থেকে ছটা যে পান ধরে, তাকে বলে পালা পান। পালা পান হলো নিরেস পান।

মিঠে পান ছাড়াও এ অঞ্চলে বাঙলা পান আর সাঁচি পান হয়। মিঠে পানের গাছ দশ থেকে পনেরো বছর থাকে। বাঙলা আর সাঁচি পানের গাছ খুব বেশি হলে তিন থেকে চার বছর থাকে। পঁচিশ সারি গাছের ভালো বরজ করতে জায়গা লাগে পাঁচ কাঠা। তা থেকে রোজগার হয় দেড়-দু হাজার টাকা। খরচ পড়বে হাজার টাকার মতো। এ হলো যখন বাজার দর ভালো থাকে তখনকার হিসেব।

চাষীরা বলে, বরজ মানে রোজ যেতে হবে। বেশি গরম, বেশি ঠাণ্ডা—এর কোনোটাই পানগাছের সয় না। তাছাড়া বরজে পোকা লাগে, পানের রোগ হয়—পান চাষে ঝকমারিও অনেক। একটা রোগ আছে। তার নাম চিংলা। পানের গায়ে বসন্তের দাগের মতো হয়। সে পান এখানে চার আনা শ। চিংলা থেকে হয় আভারি। পানের লতা পচে যায়। গাছের এক জায়গায় পচ ধরে, পরে গোটা গাছটাই মরে যায়। বল্‌মা রোগে পানের রং পোড়া হয়ে যায়, ঝল্‌সে যায়। আবহাওয়া বদলে গেলেই এ রোগ সেরে যায়। অতিরিক্ত রোগে পানের হয় তসর্‌যা—পান হয়ে যায় তসরের মতো। পাতাগুলো হয় পাঁশুটে লাল। এ রোগে গাছও যায়, পানও যায়। ফোস্কা ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলো ফেলে দিতে হয়। সব চেয়ে মুস্কিল হলো পানের রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে চাষীদের যেটুকু আছে তা হাতুড়ে বিদ্যে। সরকারি কৃষি-বিভাগের আছে অনেক ভালো ভালো গবেষণার জ্ঞান। কিন্তু দুটোর মধ্যে লেনদেন কম।

ঠিক হল ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা আমাকে কোলাঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরবেলার ট্রেনে আমি কলকাতায় পাড়ি দেব।

রূপনারায়ণে ব্রিজ হচ্ছে। দীঘায় যাবার রাস্তাও তৈরি। তাছাড়া সোজা বোম্বাই পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে। শুধু ব্রিজটার অপেক্ষা। সেই দিনটার জন্যে কোলাঘাটও অপেক্ষা করে আছে। এখন তো কোলাঘাট বলতে দেনান গ্রাম থেকে পাইকপাড়ি পর্যন্ত মাইল দুই লম্বা নদীর ধারের জায়গা।

আগে নাম শুনে ভাবতাম কোলাঘাট না জানি কী বড় জায়গা। সিনেমা মোটে একটা। শহরের লোক বলতে ব্যবসাদার আর ডেলিপ্যাসেঞ্জার। গাড়ি নেই। শুধু বড় বড় বাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদে বাহার নেই। শৌখীন স্থায়ী নাট্য সম্প্রদায় নেই। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে যাত্রা, কবিগান, পুতুল-নাচের দল আসে। কলেজেপড়া ছেলেরা চায়ের দোকানে বসে তর্ক করে গলা ফাটায় না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে, পড়ুয়া ষাট-সত্তর। রাজনৈতিক সভা হলে তেমন লোক হয় না। বড়লোক আছে যথেষ্ট। তাদের লাখ লাখ টাকার কারবার। ইউনিয়ন বোর্ডের কলকাঠি নাড়া পর্যন্ত তাদের পাবলিক অ্যাকটিভিটির দৌড়।

একেবারে নেহাতই কাঠ, পাট, কয়লা, ধানচাল আমদানি রপ্তানির জায়গা। তবে ব্রিজটা একবার হয়ে গেলে কী হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। এখানে কাঠের আট দশজন বড় বড় আড়তদার। কাঠ আসে কটক, নাগপুর, শিলিগুড়ি থেকে; যায় হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর। কড়িবরগার জন্যে শাল, চাকুন্দা, লোহাশাল, কটকী শাল, পিয়া শাল; খুঁটির জন্যে বাতিকাঠ। আসবাবের জন্যে সেগুন, সিসু। ময়না, দাসপুর, আরও নানা জায়গা থেকে আসে পাট। পাটের আড়তদারি মাড়োয়ারিদের একচেটে। কয়লার আড়তদাররা স্থানীয় বাঙালী। ধানচালে বাঙালীও আছে, মাড়োয়ারিও আছে। মাছের কারবার মরশুম নির্ভর। আড়ত একটাই।

ছেলেটি কার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল বোধহয় জানত না। এক ভাগে রুগী দেখার ঘরে রাত্তিরে আমার থাকার জায়গা হল। সারাদিন স্নান হয়নি। সিনেমা হাউসে গিয়ে অন্ধকারে টিউবওয়েলের জলে আরাম করে স্নান সেরে নিলাম। পকেটে পয়সা নেই। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। চা দিয়ে ক্ষিধেটাকে মেরে নেওয়া গেল।

এতক্ষণ চেয়ারেই বসে ছিলাম। এবার শোবার জায়গাটার দিকে তাকালাম। রবারক্লথ পাতা রুগী দেখার বিছানা। তার ওপর নিচেয় রক্ত-মোছা তুলো। শোবার চিন্তা মাথায় উঠে গেল। ঠিক করলাম চেয়ারে বসেই যতটুকু পারব ঘুমিয়ে নেব। রাত এগারোটা নাগাদ সেই ভদ্রলোক এসে হাজির ; দেখতে এসেছেন আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বিনয়ে আমার সঙ্গে তিনি পারবেন কেন ?

ঠিক যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। এটা ওটা কথার পর হঠাৎ পকেট থেকে তিনি কাগজের একটা তাড়া বার করলেন। আমাকে তিনি তাঁর কবিতাগুলো শোনাবেন। আমি একবার মেঝের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

ভদ্রলোক কবিতা শোনালেন বটে, কিন্তু সে রাতে তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। যখন তাঁর খুব হাই উঠতে লাগল, তখন আমরা গেলাম তাঁর চেনা এক গেঁজেলদের আড্ডায়। সেখানে রাত তিনটেয় চা পাওয়া গেল। তারপর আমরা দুজনেই বললাম খুব ভাল লাগল।

বলে ভোরে একেবারে ফার্স্ট ট্রেনেই সটান কলকাতা।

শিল্প সাহিত্য ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী

সত্যেশ রায়

[বিমূর্ত শিল্পীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে গত সংখ্যা পরিচয়-এ শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে সে সম্পর্কে এক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আলোচনাটি পাঠ করে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঠিক কী বলেছিলেন পরিচয়-এর অনেক পাঠক তা জানতে চেয়েছেন। তাঁদের চাহিদা মেটাবার জন্যই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নিকিতা ক্রুশ্চভের বক্তৃতার নির্বাচিত অংশের সারানুবাদ প্রকাশিত হল। এ বিষয়ে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে আলোচনা আহ্বান করছি। মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের দেওয়া হবে। তবে রচনাগুলি যেন ছোটো হয়, যুক্তিপূর্ণ হয়, উষ্মা বা ব্যক্তিগত কটাক্ষ বর্জিত হয়। একই যুক্তির পুনরুক্তিও বর্জনীয়।

সম্পাদক, পরিচয়]

বিগত শীতকালটিতে সোভিয়েত দেশে সাহিত্য ও শিল্পের সমস্যাবলী নিয়ে সতেজ ও জোরালো বিতর্ক হয়ে গেছে। শিল্প সাহিত্যের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা যে ওদেশে অত খোলাখুলি আর সামনাসামনি কেন এসেছে তা বোধহয়, বোঝা খুব দুষ্কর নয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এখন তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে ব্যাপক কমিউনিজম গড়ার জন্য দ্বাবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে রূপায়িত করার কাজে।

এরকম অতিগুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ভাবাদর্শমূলক কাজ, সাহিত্য এবং শিল্প প্রভৃতি, বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে আর জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষায় এক বড়ো ভূমিকা পালন করে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা যে—কাদের স্বার্থে সাহিত্য ও শিল্প নিয়োজিত হবে, কোন আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রনেতারা সেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের গত বছরের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ৭ই ও ৮ই মার্চ পর্যন্ত তিনবার সম্মেলন হয়। এবং ওই দুটি তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে, প্রায়

তিন মাস জুড়ে সারা সোভিয়েত দেশে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সংস্থাগুলিতে, বেতার, সাময়িকী ও সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে, বলা যায় দেশব্যাপী এক আলোচনা চলে। শুধু সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিল্পীরাই নন সাধারণ সোভিয়েত নাগরিক—পাঠক, শ্রোতা দর্শকসমাজ—এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে শিল্প-সাহিত্যের সমস্যাবলী সে দেশে শুধু লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, সোভিয়েত সমাজের ব্যাপকতম অংশও কিভাবে সৃজনশীল শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে কতখানি আগ্রহী এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে কি তাঁরা পেতে চান।

কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের সংগ্রামী অগ্রবাহিনী, সেজন্য পার্টি এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। প্রথম, ১৭ই ডিসেম্বরের তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বৈঠকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি এল. এফ. ইলিচভ পার্টির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তারপর ক্রুশ্চভ বলেন শেষের মার্চের বৈঠকে। ক্রুশ্চভ তাঁর বক্তব্যে সাহিত্য ও শিল্পের প্রধানতম তত্ত্বগত সমস্যাবলী আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন এবং ব্যাপক কমিউনিজম গড়ার যুগের কর্তব্যগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন সোভিয়েত শিল্পের মূলনীতি, যা হলো জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ ও পার্টিজান-চেতনার প্রশ্ন। ক্রুশ্চভ তত্ত্বগত দিক থেকে উপস্থাপিত করেন সেই সব প্রশ্ন ও সমস্যা যথা: শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সাহিত্য-শিল্পের ভাবাদর্শগত বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়। বৈদেশিক নীতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, কেননা পারমানবিক যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিপদ থেকে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা, এই ভয়াবহ বিপদের অবসান ঘটানোর, তাই একমাত্র পথ। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নির্দিষ্টভাবেই প্রত্যাখান করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনও আপোষ নেই। প্রণিধানযোগ্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ক্রুশ্চভের এই উক্তিটি: "মানবতার প্রশ্নে আমরা অবশ্যই নিয়ে আসব স্বচ্ছতা, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ ও কাদের জন্য। আমরা এই বিষয়টিকে,—যেমন অন্য সব বিষয়ও—দেখি শ্রেণীগত দিক থেকে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার দিক থেকে। বিশ্বে যতক্ষণ শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব আছে, 'এ্যাবসলিউট' মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। বুর্জোয়াদের জন্য, সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য যা ভালো, শ্রমিক

শ্রেণীর পক্ষে তা খারাপ, এবং অনুরূপ অপরপক্ষে, তারই উল্টোটা। শ্রমজীবী জনগণের জন্য যা ভালো তা সাম্রাজ্যবাদীদের, বুর্জোয়াদের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। আমরা চাই আমাদের নীতিগুলি সকলে উপলব্ধি করুক ভালোভাবে, বিশেষত তাঁরা, যাঁরা আমাদের উপর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দিতে চান। রাজনীতিতে ঠাট্টার স্থান নেই। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যিনি প্রচার করছেন, বিষয়গতভাবে (অবজেকটিভলি) তিনি অবস্থান নিচ্ছেন কমিউনিজম বিরোধিতার। কমিউনিজমের শত্রুরা আমাদের ভাবাদর্শ-গতভাবে নিরস্ত্র দেখতে চায়। এবং এই বিশ্বাসঘাতী উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য তারা প্রচার করতে চায় ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধুয়া, এই 'ট্রোজান ঘোড়ার' সাহায্যে তারা আমাদের মধ্যে নাক গলাতে পারলে সুখী হয়। আমরা স্থিরনিশ্চিত যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের শত্রুদের এই ছলাকলা আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক ও জনগণের বুদ্ধিজীবীদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক অখণ্ড (মনোলিথিক) ঐক্যের সম্মুখে চূর্ণ হবে।"

কমিউনিজমের গঠনকার্য ও সৃজনশীল শিল্প

নিকিতা ক্রুশ্চভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং সরকারেরও প্রধান। পার্টির ভাবাদর্শগত কমিশন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন তাতে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সমস্যা বিষয়ে ব্যাপকভাবে মতের আদানপ্রদান হয়। এই সমস্ত আলোচনার শেষে ক্রুশ্চভ সুদীর্ঘ ভাষণ দেন সমগ্র পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। প্রধান চারটি পর্বে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন। এই পর্ব-গুলি হলো: কমিউনিজমের গঠনকার্য এবং সৃজনশীল শিল্পের কর্তব্য; সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের মূলনীতি—জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তা ও পার্টিজান-বোধ (Partisanslip); ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরুদ্ধে; এবং লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব—সমস্ত সাফল্যের মূল। উল্লিখিত বিষয়সূচী-গুলিই বলা যায় ক্রুশ্চভের ভাষণের সারবস্তুকে নির্দেশ করছে। ক্রুশ্চভের এই বক্তব্যের সংক্ষেপিত বিষয়বস্তুগুলিকে তাই এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমাদের দেশের লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার, ভাস্কর,

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের শিল্পী—আমাদের সমগ্র বুদ্ধিজীবীদের কাজ সব সময়েই পার্টি ও জনগণের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। এবং এই অবস্থাটা পুরোপুরি বোঝা যায়। আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সাহিত্য ও শিল্প—লেনিন যেমন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—হয়ে উঠেছে আমাদের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করছে। কমিউনিজম গঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো—এবং এটার উপর জোর দিয়ে চাই যে—শ্রমশীল জনগণের উন্নততর জীবনের জন্য সমস্ত শর্তগুলি সৃষ্টি করা। এবং কমিউনিস্ট সমাজ হবে, এককথায় বলতে গেলে, শ্রমশীল জনগণের সমাজ।

শ্রম বস্তুটা স্বাভাবিক এবং মানুষের দৈহিক গঠনজাত প্রয়োজনেরই অঙ্গাঙ্গী। একমাত্র পুঁজিতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষকে অসহনীয় অবস্থায় ফেলে তাদের পঙ্গু করে দেয় এবং শ্রমের প্রতি এক বিকৃত ধারণার ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ব্যবস্থাকে যারা মেনে নিতে পারে না তারা শ্রমগত পদ্ধতির মধ্য দিয়েই শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে এবং হয়ে ওঠে শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সক্রিয় যোদ্ধা। আর আছে যারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে জনজীবনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামে অংশগ্রহন করে না। আরও আছে, যারা অন্যের, তার সমাজেরই প্রতিবেশীর শ্রমের ফলভোগ করে জীবনযাপন করে—এরা হলো শোষক এবং শ্রমজীবী জনগণের নিপীড়ক।

কমিউনিজম শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং একমাত্র কোটি কোটি জনগণের শ্রমের দ্বারা। এইজন্যই আমাদের পার্টি সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস করছে সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে—শ্রমিক, যৌথখামারের চাষী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ, শিক্ষক, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রের কর্মীদের—কমিউনিজমের গঠনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণে এক অখণ্ড 'কালেকটিভ' ঐক্যবদ্ধ করতে। কমিউনিজমের আদর্শে এবং চেতনায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, এই যুগে যখন আমরা কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম করছি, তখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টির আদর্শগত কার্যাবলীরও সর্বপ্রধান কর্তব্যও এখন তাই। পার্টির সমস্ত আদর্শগত হাতিয়ারগুলিকে আমাদের অবশ্যই যথাযথ সংগ্রামী অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে। কমিউনিস্ট

শিক্ষার জন্য শক্তিশালী মাধ্যম শিল্প ও সাহিত্যও তেমনই একটি হাতিয়ার।

পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্প সাফল্যের সঙ্গেই উন্নতিশীল এবং মোটের উপর সন্তোষজনকভাবেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলির সম্পাদন করছে। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলিকে বেশি বাড়িয়ে দেখাও আবার ক্ষতিকর হবে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার, চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের যেখানে গুরুতর ঘাটতির দিক আছে তাও না দেখা ঠিক হবে না। খুব বড়ো রকমের আদর্শগত কিংবা শিল্পগত ব্যর্থতা নেই এ কথা সত্য, কিন্তু আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে যে গুরুতর ত্রুটি, ভ্রান্তি ঘটেছে, সে সম্পর্কেও নির্বিকার থাকতে আমরা পারি না।

কি ধরণের শিল্পকর্ম সোভিয়েত জনগণ প্রত্যাশা করে? কোন ধরণের কাজকে তারা মূল্যবান মনে করে এবং গ্রহণ করে এবং কি তারা প্রত্যাখ্যান করে?

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্প ও সাহিত্য শিল্পগত উচ্চমান অর্জন করেছে, তার রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সম্পদ ও বিশ্বব্যাপী সুনাম। প্রতিটি সোভিয়েত রিপাবলিকেই সৃষ্ট হয়েছে এমন সব সুন্দর শিল্পকাজ যার উন্নত আত্মিক মূল্যবোধে সোভিয়েত জনগণ ন্যায়ত গর্ব অনুভব করে।

ক্রুশ্চভ দেমিয়ান বেদনির কবিতার প্রসঙ্গ আনেন। গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে সোভিয়েত জনগণ তাদের সংগ্রামে কবি বেদনির কবিতা ও গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে রক্ষার সংগ্রামে লাল ফৌজ ও পার্টিজানদের গলায় বেদনির গানগুলি বেজে উঠত।

বার্লিনে সোভিয়েত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের উল্লেখও ক্রুশ্চভ করেন। খ্যাতনামা সোভিয়েত ভাস্কর ই. ভ. ভুচেতিচ-এর এই ভাস্কর্যটিতে ফ্যাসিজমের অন্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীর সোভিয়েত সৈনিকদের স্মৃতি মূর্ত। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মস্কোয় যে বিজয়-স্মারক স্তম্ভটি ভাস্কর ভুচেতিচ রচনা করেছেন, সেই উদ্দীপ্ত ভাস্কর্যের বিষয়ও ক্রুশ্চভ বলেন। কেরবেলের কাল মার্কসের স্মৃতিমূর্তিও এরকম একটি বলিষ্ঠ ভাস্কর্য-সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কসের মহত্ব ও বিরাটত্ব এই ভাস্কর্যে সার্থক শিল্প আঙ্গিকে রূপায়িত।

ক্রুশ্চভ বলেন : আমাদের জনগণ চায় সংগ্রামী বিপ্লবী শিল্প। এবং সোভিয়েত শিল্প ও সাহিত্য প্রোজ্জ্বল শিল্পগত চিত্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিজম গড়ার এই মহান ও বীরত্বপূর্ণ যুগকে পুনঃসৃষ্টি করবে, কমিউনিস্ট সম্পর্কগুলিকে, নতুনের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়কে, সঠিকভাবে প্রতিভাত করবে—এই হলো তার সাধনা—'মিশন'। আমাদের সময়ের বাস্তবতার ইতিবাচক দিকগুলি, শিল্পীকে দেখতে সক্ষম হতে হবে এবং, সানন্দে তাকে সহায়তা দান করতে হবে। সেই একই সঙ্গে আবার নেতিবাচক দিকগুলিকেও না এড়িয়ে গিয়ে, যা নতুনের এই অভ্যুদয়ের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছে।

এমনকি খুব ভালো জিনিষেরও অন্ধকার দিক আছে, সবচেয়ে সুন্দর মুখও নিব্র্ণ নয়। সবকিছু নির্ভর করছে বাস্তবতাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে, কোন অবস্থান থেকে তার নিরূপণ—তার উপর। প্রবাদে বলে যা তুমি চাও, তা খুঁজে পাবে। অপক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি, যিনি জনগণের সৃজনশীল প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন তিনি বিষয়গতভাবে (অবজেকটিভলি) ভালো এবং মন্দ উভয়ই দেখতে পাবেন এবং উভয়েরই সঠিক উপলব্ধি ও মূল্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে যা প্রগতিশীল, প্রধান এবং আমাদের সমাজের অগ্রসরণে চূড়ান্তভাবে নিয়ামক—তাকেই তিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগাতে পারবেন।

কিন্তু যে মানুষ আমাদের বাস্তবতাকে নিঃসাড় দর্শকের (ইমপ্যাসিভ অনলুকার) মতো দেখে, সে দেখতে পায় না এবং জীবনকে বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মাঝে মাঝে এরকম ঘটে যে আমাদের শিল্পকর্মীরা বাস্তবতার বিচার করেন শুধুমাত্র আঁস্তাকুড়ের পূতিগন্ধ শুঁকে, ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে আঁকেন কদাকার, কৃষ্ণতম রঙ ব্যবহার করেন। এ সবই একমাত্র বিতৃষ্ণা, হতাশা ও নৈরাশ্যই জাগাতে পারে। এই শিল্পীরা বাস্তবতার বর্ণনা করেন তাঁদের নিজস্ব একপেশে, বিকৃত ও 'সাবজেকটিভ' ধারণা থেকে, নিজেদের 'আবিষ্কার' এক কৃত্রিম, নিরক্ত একঘেঁয়েমিপনার সৃষ্টি করে। আর্নেষ্ট নেইজভেসংনির যে সব 'বীভৎস উদ্ভাবনী'গুলি (রিভোলটিং কনককসান্স) এক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে, সেগুলি দেখে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলতে হয় যে, যে সোভিয়েত-সমাজ তাকে লালন করল, এবং যাকে একেবারে দক্ষতাহীনও বলা চলে না, সোভিয়েত জনগণের নিকট সে কী অকৃতজ্ঞতা ভরেই না ঋণশোধ দিল! এবং নেইজভেসংনি আমাদের শিল্পকর্মীদেরও মধ্যে

একক নয়, আরও কয়েকজনের বিমূর্তবাদী শিল্পও প্রদর্শনীটিতে দেখা গেছে। আমরা এর নিন্দা করি, নিন্দাবাদ করে যাব এরকম বিকলাঙ্গতার, খোলাখুলি এবং আপোষহীনভাবে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গেও ক্রুশ্চভ এসেছেন। এক্ষেত্রেও রয়েছে উচ্চ শিল্পমানের সাফল্য। কিন্তু ভাবাদর্শগতভাবে অন্তঃসারশূন্য ও নিচু শিল্পমানের ছবিও তোলা হচ্ছে, একটি নতুন ফিল্ম যার প্রাক-প্রদর্শনী হয়ে গেছে সে সম্পর্কে ক্রুশ্চভের সমালোচনা তীক্ষ্ণ। সুপরিচিত পরিচালক গেরাসিমভের নির্দেশাধীনে "জাস্তাভা ইলিচা" (ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামাঙ্কিত একটি অঞ্চল নিয়ে) নামে এই রূপকাশ্রিত ফিল্মটি তুলেছেন মার্লেন খুতাসিয়েভ নামক একজন তরুণ পরিচালক। ক্রুশ্চভ দেখান যে এই চলচ্চিত্রটিকে সোভিয়েত দেশের দুই পুরুষকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিকৃতিসাধন। ক্রুশ্চভ বলেন : পিতা-পুত্র সমস্যাটি তুর্গেনিভের সময়ে যে ধরণের ছিল, আমাদের যুগে সে রকম কোনো সমস্যার অস্তিত্ব নেই। ইতিহাসের সম্পূর্ণ যে ভিন্ন যুগে আমরা বাস করছি, মানবিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে তার এক নিজস্ব প্যাটার্ণ রয়েছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুরুষপরম্পরায় মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই এবং অতীত যুগে "পিতা-পুত্র" সমস্যা বলতে যা বোঝাত তাও বর্তমানে অতীত হয়ে গিয়েছে। উল্লেখিত ফিল্মটির প্রযোজকরা নিজেদের মাথা থেকেই "সমস্যা" বানিয়ে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছেন, যার উদ্দেশ্যকেও সাধু বলা যায় না। খুব উচিতভাবেই তাই, পরিচালক খুতসিয়েভ এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক গেরাসিমভকে জিজ্ঞাসা করা যায়—এ রকম ছবি করার দুর্ভাবনা তাঁদের মাথায় এল কি করে?

পার্টিজ্ঞানবোধ ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক

সম্প্রতি কয়েক বছরে সোভিয়েত লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের সৃজনাত্মক কাজে সোভিয়েত সমাজের স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রকালীন পর্যায়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন। ক্রুশ্চভ বলেন, এর যৌক্তিকতা রয়েছে এবং এই মনোযোগের কারণও যথেষ্ট বোধগম্য। এমন সমস্ত সাহিত্য ও শিল্প রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যাতে ব্যক্তিতন্ত্রের বছরগুলির সোভিয়েতের বাস্তবতা বিশ্বস্তভাবে এবং পার্টি অবস্থানের দিক থেকে চিত্রিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্রুশ্চভ উল্লেখ করেন আলেকসান্দর ভার্দোভস্কির উপন্যাস "দূর দিগন্ত," সোলঝেনিৎসিনে'র

লেখা "ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একটি দিন" ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো রচিত কিছু কবিতা, চুকরাই পরিচালিত চলচ্চিত্র "পরিচ্ছন্ন আকাশ" প্রভৃতি শিল্পসৃষ্টি। ক্রুশ্চভের বক্তব্য যে, প্রকৃত সততাযুক্ত শিল্পরচনা পার্টি সমর্থন করে জীবনের নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে সে কাজ রচিত হলেও, যদি তা নতুন সমাজ গঠনে জনগণেয় প্রযত্নের প্রতি সহায়তা, জনগণের শক্তিকে সংহত এবং জোরালো করার জন্য নিযুক্ত হয়। আমরা জানি শ্লেষাত্মক সাহিত্যের, গল্প, নাটকের এদিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন বলা যায় সের্গেই মিখালখভের এই জাতের লেখাগুলি। শ্লেষ যা হলো ধারালো ছুরির মতো। দক্ষ সার্জেনের হাতে যেমন শরীরের বিষাক্ত বিস্ফোটক কেটে বাদ দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যেরই প্রয়োজনে। তেমনি। কিন্তু তার জন্য দরকার সেরকম অভিজ্ঞ দক্ষ হাত। যদি সেরকম দক্ষতা না থাকে, ওকাজে হাত না লাগলেই ভালো। তাতে অন্যের আখেরে ক্ষতিই হয়, হয়তো কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে নিজের আঙুলটাই কেটে যায় পর্যন্ত। তাই সবারই সবকাজে হাত না দেওয়া ভালো। মায়েরা যখন ছেলেদের হাতে ধারালো জিনিষ দেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্যবহারের জ্ঞান শিশুটির জন্মায়, তখন তাঁরা ঠিক কাজই করেন।

সত্য যে ব্যক্তিতন্ত্রের বছরগুলি এক দুর্বহ স্মৃতি, ক্রুশ্চভ যাকে বলেন এক "গ্রীভাস হেরিটেজ" রেখে গেছে। সোভিয়েত পার্টি তার সম্পর্কে সমগ্র সত্য জনগণকে জানিয়েছে। কিন্তু, ক্রুশ্চভ বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে সেই সব বছরগুলি সোভিয়েত সমাজের বিবর্তনে শুধু বদ্ধতার যুগই ছিল না, আমাদের শত্রুরা যেভাবে তা দেখাতে চায়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং লেনিনের ভাবাদর্শে ও উত্তরাধিকারে অনুপ্রাণিত আমাদের জনগণ সাফল্যের সঙ্গেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিল এবং তার নির্মাণকার্য শেষ করছিল। পার্টি ও জনগণের প্রযত্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল যা সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়, ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর উৎসাদন করে, ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়ী হয়ে। সেজন্য যে সব লেখকরা সোভিয়েত জীবনের এই অধ্যায়টিকে নিতান্ত একপেশে ভাবে দেখেছেন, সবকিছুকেই নিছক কালোরঙে বর্ণনা করেছেন—আইনভঙ্গ, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এইগুলিকেই সবকিছু ভেবেছেন, তাঁদের পথ ভ্রান্ত। ফেলে দেওয়া জঞ্জালস্তূপ থেকে বিষয়বস্তু টেনে নিয়ে সেগুলিকেই অনেক লেখক

'বাস্তবতার বিশ্বস্ত ছবি' বলে দেখাতে চান। এই সব লেখকের মতে যে সব বইতে আমাদের জীবনের ইতিবাচক দিক, জনগণের কৃতিত্ব ও অর্জনকে বিবৃত করা হয়েছে, সেগুলি হলো "বার্নিশ করা।" এ দৃষ্টিভঙ্গী আমরা গ্রহণ করতে পারি না। জানি যে, এমন কিছু লেখা হয়েছে যাতে "পালিশ চড়ানো" আছে, পার্টি তার সম্পর্কে নঙর্থক মনোভাবই ব্যক্ত করেছে। ব্যক্তিতন্ত্রের ঐসব বছরগুলিতে সবকিছুই খারাপ ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ওই যুগেও জনগণ যথেষ্ঠ বীরত্ব দেখিয়েছে, সবকিছুকেই আমরা তাই কালো রঙ মাখিয়ে দেখাতে পারিনা। যে সব লেখকরা শুধু তাই করেন ক্রুশ্চভ তাঁদের নাম দেন "কালিমালেপনকারী"। ক্রুশ্চভ বলেন, লেখক ও শিল্পীদের দৃষ্টি ফেলতে হবে বাস্তবতার গভীরে এবং সঠিকভাবে তা বর্ণিত হতে হবে। প্রত্যেক শিল্পীকেই জনসাধারণ গ্রহণ করবে রচনার গুণের বিচার দিয়ে। ব্যক্তিতন্ত্রের যুগে যে লেখক আমাদের জীবনের সদর্থক দিকটিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন, অনেকে তাঁদেরও নিন্দাবাদ স্বরু করেছেন। এটা ঠিক নয়।

ইলিয়া এরেনবুর্গের স্মৃতিকথার প্রসঙ্গ এই সূত্রে আসে। ক্রুশ্চভ বলেন, এরেনবুর্গ সব কিছুকেই আঁধার বর্ণে চিত্রিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিতন্ত্রের যুগে নিজে দমন ও বিধিনিষেধের অধীন হন নি। কিন্তু গালিনা সেরেব্রাকোভার মতো লেখিকাকে কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েন নি, পার্টির আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এবং পুনর্বাসনের অব্যবহিত পরেই আবার সৃষ্টিধর্মী কাজে কলম ধরেন। শ্রীমতী সেরেব্রাকোভার হাত থেকে পার্টি ও জনগণ সে সময়ের যথার্থ চিত্র পেয়েছে।

স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রের যুগের প্রশ্নটি নিয়ে ক্রুশ্চভ এই প্রসঙ্গে আবারও আলোচনা করেন। ক্রুশ্চভ বলেছেন: প্রায়ই জানতে চাওয়া হয় যে স্তালিনের জীবিতকালেই কেন আইনের লঙ্ঘনগুলি, ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করা ও যাতে তা আর বাড়তে না পারে সেরূপ করা হয় নি? তখন কি তা সম্ভব ছিল?

এই প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পার্টির দলিলাদিতে বহুবার পুরোপুরি ও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যত এখনও অনেকে আছেন, তার মধ্যে শিল্পী সাহিত্যিকও, যাঁরা এই ঘটনাগুলিকে বিকৃত আলোয় দেখতে চান। নেতৃ-স্থানীয় পার্টি কর্মীরা কি গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলি জানতেন? হাঁ, জানতেন। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন নির্দোষ লোকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? না, এ তাঁরা

জানতেন না। তাঁরা স্তালিনের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং কল্পনাও করতে পারেন নি যে সৎ, আদর্শনিষ্ঠ মানুষও দমন-পীড়নের শিকার হবেন।

ক্রুশ্চভ অতঃপর বিবৃত করেন অক্টোবর বিপ্লবের সুরু থেকে যত দিন না শোষক শ্রেণীগুলির চূড়ান্ত উৎখাত শেষ হয়, ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজ কি তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রেণী-শত্রুরা সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ, হত্যা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়। বিপ্লবের জয়কে রক্ষা করা কি প্রয়োজন হয়ে পড়ে নি? হয়েছিল। এবং প্রথম দিন থেকে দৃঢ়হাতেই তা করা হয়। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার কয়েকমাসের মধ্যেই লেনিন স্বাক্ষর দেন এক আদেশে যার দ্বারা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সারা-রুশ জরুরী কমিশন—বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বহারার একনায়কত্বের শাণিত অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তালিন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহনের দায়িত্বে ছিলেন এবং জনগণের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামের ধ্বনির মাধ্যমে এই তীব্র সংগ্রাম চালান। এ ছাড়া সে সময় কোনোও উপায়ও ছিল না। কেননা পার্টির ইতিহাসে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্টেট ডুমায় বলশেভিক গ্রুপেরই একজন সদস্য ম্যালিনোভস্কি যে পুলিশের চর ছিল, তা ধরা পড়ে।

সমাজতন্ত্রের নির্মাণ ও বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে পার্টির এই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকায় স্তালিনের মর্যাদাও বেড়ে যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে, ঐ সময়ে ও পরবর্তী সমাজতন্ত্র গঠনেরকালে স্তালিনের অবদান সুপরিচিত ছিল। বিশেষতঃ পার্টির ভিতরকার বিরোধী গোষ্ঠী ও লেনিনবাদ বিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্তালিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পার্টির মধ্যে ট্রটস্কিবাদ জিনোভিয়েভবাদ, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি লেনিনবাদবিরোধী ধারাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে পার্টি ও সরকারকে শক্তিশালী করার এটি পর্যায় ছিল। লেনিনের মৃত্যুরপর ট্রটস্কিবাদী ও জিনোভিয়েভবাদীদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পার্টিজীবন ও সমাজতন্ত্রের গঠনকার্যের মৌল বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভের সহযোগীদের কার্যকলাপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে এবং লেনিনবাদ বিরোধী সমাজতন্ত্র বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়ে যায়। ট্রটস্কিবাদীদের পর পার্টিকে লেনিনবাদী নীতির জন্য ঝুঝতে হলো বুখারিন, রিয়াকভ ও টমস্কির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে,—লেনিনের নীতি অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি যৌথ করণের জন্য। লেনিনের মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে ট্রটস্কিবাদী, জিনোভিয়েভবাদী, বুখারিনবাদী এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদী নীতি উর্দ্ধে তুলে রাখার জন্য পার্টির নিরন্তর সংগ্রামে স্তালিনের অবদান বিরাট। এজন্য পার্টি ও জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁর উপর এবং তাঁর কার্যাবলীর সমর্থনে।

কিন্তু স্তালিনের নিজের চারিত্র্যবৈশিষ্টের মধ্যেই গুরুতর ত্রুটি ও ভুল ছিল, লেনিন তাঁর জীবিতকালে যে দিকে পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

লেনিন দেখিয়েছিলেন স্তালিনের হাতে বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার বিপদ, যা স্তালিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁর স্বভাবগত বড় ত্রুটির জন্যই। সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে বদল করার উপদেশ দিয়ে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখেছিলেন ঐ পদ আর কোনো নেতার হাতে দেবার যাঁর থাকবে "স্তালিনের থেকে বেশি সহিষ্ণুতা, অধিকতর সহমর্মীতা, আরও সৌজন্যশীল, অন্যান্য কমরেডদের প্রতি বিবেচনা-পরায়ণ, কম অব্যবস্থিতচিত্ত ইত্যাদি।

লেনিন স্তালিনকে মনে করতেন পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান, মার্কসবাদী, বিপ্লবের প্রতি অনুগত। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের কাছে লেনিন তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে এক চিঠিও দেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তা তলিয়ে ভাবেন। এ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে শক্তিসম্পর্ক খুঁতিয়ে দেখা হয়। নেতা হিসেবে স্তালিনের ইতিবাচক দিকগুলি ওজন করে দেখে এবং লেনিন-নির্দেশিত ব্যক্তিগত ঘাটতির দিকগুলি তিনি উৎরে নেবেন বলে স্তালিনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্তালিন এ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন এবং পার্টি তাঁর ওপর যে আস্থা ন্যস্ত করেছিল তার অপব্যবহার করেন। এরই পরিণতি হল ব্যক্তিতন্ত্রের যুগের বেদনাদায়ক সংঘটনগুলি। পার্টি জীবনের লেনিনীয় মানগুলি স্তালিনের দ্বারা স্থূলভাবে লঙ্ঘনের ব্যাপারে পার্টি আপোষহীন নিন্দাবাদ করেছে। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, কমিউনিস্ট স্বার্থের গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিন যে কাজ দিয়েছেন পার্টি তা যথার্থতার সঙ্গে স্বীকার করে। আজও আমরা স্তালিনকে কমিউনিজমের

প্রতি বিশ্বস্ত, একজন মার্কসবাদী বলে মনে করি। তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির যে সব স্থূল ভ্রান্তিগুলি তিনি করেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর অপরাধ নিহিত। সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতিগুলি লঙ্ঘন ও পার্টি এবং জনগণ তাঁর উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল তার অপব্যবহার স্তালিন করেছিলেন। ক্রুশ্চভ বলেন যে, স্তালিনের অন্ত্যেষ্টির সময় তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন এবং তা ছিল আন্তরিক অশ্রু, যদিও জানা ছিল স্তালিনের ব্যক্তিগত অপূর্ণতাগুলি, কিন্তু তাঁর ওপর ছিল বিশ্বাস, আস্থা। এই বিশ্বাসের জন্যই মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনেও বিশিষ্ট বলশেভিক সামরিক নেতা সম্পূর্ণ নিরপরাধ যাকির বলতে পেরেছিলেন তাঁর এই শেষ কটি কথা "স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন।" কেননা মৃত্যুর মুহূর্তেও যাকির বিশ্বাস করেছিলেন, সম্পূর্ণ নির্দোষ তাঁকেও যে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয় স্তালিনের হাত নেই। এবং যাকির এরকম মাত্র একজন নন।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে স্তালিন হয়ে পড়েছিলেন এক গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি—পার্সিকিউশন কমপ্লেক্সে এবং সন্দেহপরায়ণতায় ভুগতেন।

স্মৃতিচারণ সাহিত্যের অনুরাগী অনেক সাহিত্যিক প্রায়ই এই সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত করতে গিয়ে এমনভাবে বিষয়টিকে দেখেন যাতে মনে হয় যে তাঁরা সমস্ত বিষয়টিকে যেন দূর থেকে নিরীক্ষণ করেছেন, যেন অন্য কোনো দেশে থেকে, দূরত্ব বজায় রেখে।

কিন্তু এমন কমরেডরাও রয়েছেন, যাঁরা স্তালিনের এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলাফল নিজের ব্যক্তিগতভাবে বোধ করেছেন, এবং সেই অভূতপূর্ব বিপদের সময়েও এই সব বিষয় মেনে নিতে পারেন নি, প্রতিবাদ করেছেন, স্তালিনের কাছে বিবৃতি, প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন।

১৯৩৩ সালের বসন্তে এরকম চিঠি লেখেন স্তালিনের কাছে বিখ্যাত লেখক মিখাইল শোলোকভ। ডন অঞ্চলে এরকম আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে শোলোকভের লিখিত দুটি প্রতিবাদপত্র ও স্তালিনের উত্তরও এখন জানা গেছে। শোলোকভের এই চিঠি দুটি যন্ত্রণাপীড়িত হৃদয়ের সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। ডন জেলার ভেশেনস্কায়া ও অন্যান্য এলাকায় যে সব অপরাধের ঘটনা সংঘটিত করা হয় তার বিরুদ্ধে এই পত্রগুলি ছিল নির্ভীক ধিক্কার। একজন প্রকৃত বলশেভিকের মতই মিখাইল শোলোকভ এই সব জাজ্বল্যমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন, হাল ছেড়ে দেন নি। তৎকালীন

অরাজকতার বিরুদ্ধে শোলোকভ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যেমন শোলোকভের সতর্কবাণীর প্রতি তেমনি অন্যান্য সাহসী কমিউনিস্টদের সতর্কীকরণের সম্পর্কেও স্তালিন সম্পূর্ণ বধির হয়ে থাকেন। স্তালিনের মৃত্যু এবং বেরিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনের পরই এই সব অরাজকতা ও স্তালিনের ক্ষমতার অপব্যবহারের তথ্যগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্রুশ্চভ বলেন, সব কথাই মনে রাখতে হবে। এবং সোভিয়েত সমাজ ও জীবনের বর্তমান ও অতীত নিয়ে যিনি লিখতে বসবেন, তাঁর তাই ইতিহাসের ঘটনাবলীর গভীর বিশ্লেষণের পর্যবেক্ষণশক্তি আয়ত্ত করা দরকার। এ কাজ সোজা নয়। কিছু সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাজে এবং ফিল্ম দেখে বিস্ময় বোধ করতে হয় যে, এই সব লেখকরা তাঁদের ব্যক্তিগত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত অসুবিধা ও প্রতিক্রিয়াগুলি বলছেন। জনগণের গঠনাত্মক কাজে যাঁরা কোনও অংশ গ্রহণই করেন নি তাঁদের দ্বারাই এরকম 'বাস্তবতা'র ছবি দেওয়া যেতে পারে।

একজন ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতার নিরূপণ নির্ভর করে সেই সময় ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই ব্যক্তির ভাবাদর্শগত বোধের উপর। আমাদের পার্টি সাহিত্য ও শিল্পে পক্ষপাতাশ্রয়ীতার পক্ষে সর্বদা আছে। পার্টির ও পার্টির বাইরের লেখক ও শিল্পী যাঁরা শিল্পদৃষ্টিতে কমিউনিজমের সঙ্গে দাঁড়ান, পার্টি সেই সব তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের স্বাগত জানান।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সমাজে কোনো অপক্ষপাতাশ্রয়ীতা (নন-পার্টিজানশিপ) বলে কিছু নেই। যিনি নিজের এই অপক্ষপাতাশ্রয়ী মনোভাব জাহির করেন, তিনি তা করেন প্রকৃতপক্ষে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য গোপন করার জন্য। তিনি চান তাঁর মতের সমর্থক বাড়াতে। ইতিহাসে বহু সময় দেখা গেছে বহু প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী ব্যক্তি এই অপক্ষপাতাশ্রয়ী ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এবং পরে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের বুর্জোয়াদের পক্ষপাতাশ্রয়ীতার প্রমাণ।

সোভিয়েতের গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে যখন প্রতিবিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছিল, তখন আমাদের শ্রমজীবী জনগণ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই রাজনীতিগতভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁদের রাজনৈতিক অ, আ, ক, খ শেখায় আর তাঁরা বুঝতে পারেন কার পক্ষ বেছে নেবেন এবং বলশেভিক হয়ে ওঠেন।

এই বাস্তবতার যথার্থ চিত্রণই দিমিত্রি ফুর্মানোভের উপন্যাস 'চাপায়েভ' (ঐ উপন্যাসের চিত্ররূপটিতেও), আলেকসান্দর সেরাফিমোভিচের 'আয়রন ফ্লাড', আলেকসান্দর ফাদায়েভের 'দি নাইনটিন', নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'হাউ দি স্টীল ওয়াজ টেম্পারড' এবং অন্যান্য সোভিয়েত বিপ্লবী লেখকদের গ্রন্থে ফুটে ওঠে। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমানে কিউবায় এবং অন্যান্য অনেকগুলি দেশ যারা এখন স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে সে সব দেশে 'হাউ দি স্টীল ওয়াজ টেম্পারড'-এর মতো সোভিয়েত উপন্যাসের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নয়

ক্রুশ্চভ বলেন: ইতিহাসের অভিজ্ঞতা শেখায় যে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামে শুধু কথায় নয়, কার্যাবলী দেখে বিচার করতে হয়। বিচার করতে হয় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি রয়েছে কোথায় এবং কেন। এবং তজ্জন্য মার্কসবাদী—লেনিনবাদী হতে হয়, একজন কমিউনিস্ট যার জীবন ও প্রতিভা নিয়োজিত হবে এই পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে। শ্রেণীসংগ্রামের পরিধির বাইরে সমাজের কোনও অংশই থাকতে পারে না। এমন কি একটি পরিবারও এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে।

এক স্তরের মানুষ আছেন, যাঁরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ না করার যুক্তি হিসেবে তথাকথিত 'মানবিক' প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিপ্লব সামাজিক শ্রেণীগুলির দ্বারা সাধিত হয়। পুঁজিতন্ত্রের অবসানের জন্য শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী যে বিপ্লব সাধন করেন তা হল সর্বাধিক মানবিক সক্রিয়তা। শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা মানবতাবাদেরই চূড়ান্ত প্রকাশ। শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাত না হলে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি ও তাদের সুখীজীবন গঠন হতে পারে না। এটা কি বোঝা খুবই শক্ত যে যারা সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ গ্রহণ করছে না তারা কার্যত বুর্জোয়াদের সাহায্য করছে? যারা শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে নেই তারা অনিবার্যভাবে তাদের বিরুদ্ধে আছে। এটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে।

আবার এমনও ব্যক্তি আছেন যাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ গ্রহণ করেন বলেন এবং অনেক সময়ে কমিউনিজমের পক্ষে দাঁড়ান কিন্তু সংগ্রামে

সক্রিয়ভাবে অংশ নেন না। তাঁরা শুধুমাত্র যোদ্ধাদের পথেই দাঁড়ান নিজেরা হতবুদ্ধি হয়ে এবং অপরকে হতবুদ্ধি করে। বিপ্লব শুধু একটি সদিচ্ছা মাত্র নয়, এ এক কঠোর ও তীক্ষ্ণ সংগ্রাম। বিপ্লবের জন্য লড়তে হয়, শুধু বিপ্লব করার সময়েই নয় তার জয়কে সংহত করার পর্যায়েও, কমিউনিজমের নির্মাণপর্ব পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ বিপ্লবের সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সশস্ত্র শ্রমিক ও শত্রুপক্ষের গুলিবিনিময়ের মাঝখানে ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলির ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা করে এ. ভি. লুনাচারস্কী একবার লেনিনের কাছে প্রতিবাদ করেন এবং এমন কি সোভিয়েত সরকার থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন। লেনিন এতে শুধু হেসেছিলেন, বিপ্লবের এই উন্নাসিক ধারণায়। পরে লুনাচারস্কী নিজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ আবার এরেনবুর্গের কথায় আসেন; কমরেড এরেনবুর্গ একবার প্যারিসে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং লেনিন তাঁকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন, এরেনবুর্গ নিজেই লিখেছেন। কমরেড এরেনবুর্গ পার্টিতে যোগ দেন এবং পরে পার্টি থেকে সরে যান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তিনি কোনো প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন নি, তিনি বাইরে থেকে দর্শকের ভূমিকা বজায় রাখেন। এ কথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না যে কমরেড এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথা 'মানুষ, বছর, জীবন' বইতে আমাদের বিপ্লব ও পরবর্তী সমগ্র সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পর্যায় সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তা তাঁর ঐ ভূমিকা থেকে আসে।

সোভিয়েত লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার এবং সমস্ত সৃজনশীল শিল্পের কর্মীদের কমিউনিজম গঠনকারীদের সারিতেই স্থান নিতে হবে, পার্টির আদর্শ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ের জন্য তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে বিশ্বে আজ দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ ভাবাদর্শের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলেছে—সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া। আমাদের শিল্পীর দায়িত্ব হল তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা কমিউনিজমের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠ করা, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানা, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। পার্টিগত উপলব্ধি ও দেশপ্রেম অনুগত মহা শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসাবে ক্রুশ্চভ মিখাইল আলেকসান্দ্রোভিচ শোলোকভের রচনাবলীর উল্লেখ করেন। শোলোকভের 'ধীরে বহে ডন', 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড', 'একজন মানুষের ভাগ্য' এবং তাঁর

নতুন উপন্যাসের প্রকাশিত অধ্যায়গুলি। শোলোকভের শিল্পকর্ম এই কথাই প্রমাণিত করে যে কমিউনিস্ট পক্ষাশ্রয়ীতা লেখকের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে সীমায়িত করা তো দূরের কথা তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করতে এবং রচনার সামাজিক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে সহায়তাই দান করে।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমরা শিল্পে শ্রেণীগত অবস্থান গ্রহণ করি এবং জোরালোভাবে বিরুদ্ধতা করি সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। শিল্প প্রবেশ করে ভাবাদর্শের (ইডিওলজি) পরিধির মধ্যে। যাঁরা মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আঙ্গিক সর্বস্বতা, বিমূর্তবাদ প্রভৃতি ধারাগুলি সোভিয়েত শিল্পে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে অনিবার্যভাবে তাঁরা নেমে যান ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের অবস্থানে—ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থানে। আমরা সম্প্রতি এরূপ এক ধারার সম্মুখীন হচ্ছি। দুর্ভাগ্যত এটা একটা ফাঁদ—কিছু কমিউনিস্ট, লেখক ও শিল্পী এমন কি আমাদের সৃজনশীল শিল্পে কিছু নেতৃত্বস্থানীয়রাও এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।

কমরেড এরেনবুর্গ অবশ্য বলেছেন তিনি যখন ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলেছিলেন তখন তা নেহাতই পরিহাসচ্ছলে বলা: এ কথা বললে অবশ্য ভালো কথা। কিন্তু এরেনবুর্গ যে পরিহাসই করে থাকুন তা খুবই খারাপ পরিহাস।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমি পূর্বেই বলেছি ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বিমূর্ত শিল্প, আঙ্গিক সর্বস্বতা, সমাজতান্ত্রিক শিল্পে এই ধারায় অস্তিত্ব রক্ষা করার কথা যাঁরা বলেন—তাঁদের বুঝতে হবে—এগুলি হলো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আঙ্গিক। কমরেড এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "তৎকালে ছিল নানা শিল্পমতের 'স্কুল': কমিউনিস্ট-ভবিষ্যবাদী, চিত্রকল্পবাদী, প্রলেটকাল্টবাদী, প্রকাশবাদী, উদ্দেশহীনতাবাদী, বর্তমানবাদী, আকস্মিকতাবাদী, এবং এমন কি কিছু-না বাদী। অবশ্যই, কিছু তাত্ত্বিক নানা ধরণের অর্থহীন কথা বলেন···আমি কিন্তু সেই ফেলে আসা সময়ের সমর্থনে দাঁড়াতে চাই।" স্বভাবতই প্রকাশ পেয়েছে, লেখকের রয়েছে তথাকথিত ঐ "লেফট" ধারাগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং এই সবের প্রতি অনুমোদন জানাতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। প্রশ্ন আসে কাদের বিরুদ্ধে

তিনি এ সবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। স্বভাবতই, আমাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? স্বভাবতই আমাদের আধুনিক শিল্পে অনুরূপ সম্ভাব্য ধারাগুলির পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করতে। এর মানে হলো সোভিয়েত শিল্পে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আঙ্গিক সর্বস্বতাবাদের সহাবস্থানকে মেনে নেওয়া। কমরেড এরেনবুর্গ একটি গুরুতর আদর্শগত ভুল করছেন, আমাদের কর্তব্য হলো তাঁকে এটি বুঝতে ও সংশোধনে সাহায্য করা। তরুণ কবি ইয়েভতুশেঙ্কোও তাঁর বিমূর্ত শিল্পের পক্ষে বক্তব্যে কমরেড এরেনবুর্গের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো, বাস্তবতাবাদী ও আঙ্গিক সর্বস্বতাবাদী উভয় দিকেই ভালো লোক আছে। কমরেড ইয়েভতুশেঙ্কোর দৃষ্টান্তকে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু আদর্শগত কমিশনে তাঁর বক্তৃতায় অবশ্য তিনি নিজের দোলাচলা থেকে উত্তীর্ণ হবার আশ্বাস দিয়েছেন। ইয়েভতুশেঙ্কো এবং তরুণ লেখক যাঁরা জনগণের আস্থা অর্জন করতে চান, তাঁদের পরামর্শ দিই যে শস্তা উত্তেজনার দিকে যাবেন না, উন্নাসিকদের মনোভাব ও রুচিকে পরিবেশন করবেন না। মনে রাখতে হবে আমরা যখন আপনাদের সমালোচনা করি নীতিগত অবস্থান থেকে আপনাদের বিচ্যুতির জন্য, তখন শত্রুরা আপনাদের প্রশংসা শুরু করে। এবং আমাদের আদর্শের বিরোধীরা তাদের মনোমত লেখার জন্য যদি আপনাদের প্রশংসা করে, তবে আমাদের জনগণ ন্যায়তই আপনাদের সমালোচনা করবে। সুতরাং বেছে নিন কোনটি আপনাদের পক্ষে ভালো। কমিউনিস্ট পার্টি বিমূর্ত শিল্প এবং আঙ্গিক সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং করবে। ফর্মালিজম সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। অনেকে বলে উঠবেন, ক্রুশ্চভ তা হলে ফটোগ্রাফিক শিল্প, শিল্পে প্রকৃতিবাদ চাচ্ছেন। না, কমরেডরা, মোটেই না। আমরা চাই চারপাশের বাস্তব জগতকে তার বহুবিচিত্র বর্ণবহুলতায়, রঙে, রেখায় বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করবে এমন এক প্রাণবন্ত শিল্প। এমন শিল্প সৃষ্টিই জনগণের হৃদয় ও মন অধিকার করতে পারবে। আঙ্গিকসর্বস্ব ও বিমূর্তবাদী শিল্পীরা ও তার সমর্থকরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে এখন রক্ষণশীল বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পীদের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন,—জনগণ জানেন আসলে প্রশ্নটি হলো প্রকৃত শিল্পী ও প্রকৃত শিল্পের প্রশ্ন। শিল্পে বিকৃত রুচি ও মনোভাব প্রচার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

'সৃজনশীল শিল্পের প্রশ্নে আমাদের নীতি হলো বিমূর্ততা, আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং শিল্পে এই ধরনের বুর্জোয়া অপসৃষ্টির বিরুদ্ধে নিরন্তর বিরোধিতা, এই লেনিনবাদী নীতি আমরা দ্বিধাহীন ভাবে অনুসরণ করে এসেছি ও করে যাব। লেনিন মনে করতেন সাহিত্য ও শিল্প জনগণের শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে অবশ্যই নিয়োজিত হবে।

তথাকথিত "বামপন্থী শিল্প"কে লেনিন অভিহিত করতেন, অর্থহীন বিদূষণ এবং তাকে অস্বাভাবিক সর্বনেশে বলে মনে করতেন। এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতি-কথায় এক স্থানে লিখেছেন: "এ. ভি. লুনাচারস্কী আমাকে বলেন যে, 'লেফট' শিল্পীরা মে-দিবসের জন্য রেড-স্কোয়ার সজ্জিত করতে পারবে কিনা। যখন তিনি লেনিনকে তা জিজ্ঞাসা করেন লেনিন তখন উত্তর দেন: আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই, আমার রুচি অপরের উপর চাপাতে চাই না।" এরেনবুর্গ লেনিনের এই উক্তিকে সোভিয়েত শিল্পে বিভিন্ন ভাবাদর্শগত ধারার সহাবস্থানের পক্ষে যায় বলে বোঝাতে চেয়েছেন। এটা ঠিক নয়। সাহিত্য ও শিল্পের ভাবাদর্শগত মূল্যের ও পার্টিজানত্বের নীতির প্রবক্তা লেনিনই ছিলেন। পরবর্তী যুগে গর্কি ও অন্যান্য সোভিয়েত নেতৃস্থানীয় লেখকরা এই নীতিকেই তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পার্টিজানবোধ ও ভাবাদর্শগত ও শিল্পগত গুণাবলীর কারণেই ম্যাকসিম গর্কির "মা" উপন্যাসটিকে লেনিন অত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়েছিলেন।

* * * *

ক্রুশ্চভ তাঁর এই সুদীর্ঘ ভাষণটিতে সাহিত্য ও শিল্পের নানা দিক বিষয় এবং ভাবাদর্শের দিক থেকে পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার পরিধিও বিস্তীর্ণ। এই আলোচনা বিশেষ সংক্ষেপিত ভাবেই উপস্থিত করা গেল, কারণ, স্বভাবতই স্থানাভাবের সমস্যাটি থাকে। সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিক, জনগণ ও পার্টির নেতৃবর্গ যে ওদেশের শিল্প-সাহিত্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে এরকম খোলাখুলি মতবিনিময়ে মিলিত হতে পেরেছেন, তাতে বিংশতি ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী বছরগুলিতে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে, তারই প্রকাশ। ক্রুশ্চভ নিজেই বলেছেন: আমরা যে পরস্পর মিলিত হয়ে যে সব সমস্যাগুলি এখন আমাদের চিন্তিত করছে তাই নিয়ে আলোচনা করছি, আমাদের দেশের নতুন আবহাওয়াকেই তা প্রকাশিত করে।

বি জ্ঞা ন প্র স ঙ্গ

De l'e´ternel azur la Sereiue ironic

—Mallarme

আপেক্ষিকতাবাদ কি কোনো বিপ্লব

মননের আদর্শ বাস্তবের প্রয়াসকে নিরুত্তাপ দূরত্ব থেকে বিদ্রূপই করে চিরদিন—ফরাসী প্রতীকী-কবি মালার্মের এই পরাভবের যন্ত্রণা, বিজ্ঞানীর জন্য এক অনির্বাণ প্রেরণার মতো। পদার্থবিজ্ঞান প্রাকৃত বাস্তবের সেই চত্বরে তার আসন পেতেছে প্রকৃতি যেখানে প্রাণিক স্পন্দনে বিচিত্র হয়ে ওঠে নি, চেতনা যেখানে তার নির্মোক ছিঁড়ে ফেলে, বিশ্ব-বিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হতে পারে নি। স্বাধীন ইচ্ছা নেই অথচ সত্তা আছে, এমন একটি জ্ঞেয়কেই পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলা চলে। তাকেই 'ম্যাটার' বলা হয়, আর তারই সার্বিক envelope কিম্বা material world হলো পদার্থবিজ্ঞানের সীমা। ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যদি এই হয়, তার অজস্রতার ভেতরেও একটা ঐক্যের উপস্থিতি অনিবার্য। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে আমাদের তত্ত্ব থেকে যেন জড়ের এই অস্তিত্বের ঐক্যতানটুকু হারিয়ে না যায়—যে-কোনো ভাষাতেই বা যে-কোনো ভাবেই বলা হোক, বিজ্ঞানের কাছে আইনস্টাইনের দাবির রূপরেখা এই ছিল।

প্রকৃতির রাজ্য প্রতিসাম্যের দুর্লঙ্ঘ বিধি—এই প্রত্যয় থেকেই আইস্টাইন চেয়েছিলেন পদার্থবিদ্যার সমস্ত সমীকরণ এবং সূত্রগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য আনতে। তাই বলে, 'ইন্ডাকটিভ' পদ্ধতিতে নয়। সেই মূল ঐক্যের তত্ত্ব থেকে যেন তথ্যের মতো বিশ্লেষণ করা যায় সমস্ত বিশেষ অভিজ্ঞতার। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এই অভীপ্সা পূর্ণসিদ্ধির সাক্ষাৎ পায় নি; তার সম্ভাবনাকে শুধু মুক্ত রেখে এই বিরাট যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত লোকান্তরিত হয়েছেন। তার চেয়ে ঢের আগে উৎসাহী অনেক সহকর্মীর প্রাণে 'হেমন্ত আসিয়া গেছে' জেনেও, একে-একে অনেকেই piecemeal পদার্থবিজ্ঞান নির্মাতাদের সঙ্গী হয়েছেন দেখেও, সপ্ততিপর মহাবিজ্ঞানী শেষ দিনটি পর্যন্ত নিষ্ঠা এবং আস্থা নিয়ে সেই অপসৃয়মান আদর্শের সন্ধান করে গেছেন। আদর্শ বিদ্রূপ করবেই বাস্তব প্রয়াসকে। মালার্মের ছিল 'সৎ ক্ষোভ'—আধুনিক মানসে আছে আদর্শের 'অবজেক্টিভিটি'-তেই সংশয়।

আইনস্টাইনও তাঁর বিজ্ঞানের অনুধ্যান শুরু করেন সৎ সংশয়ের ভিত্তিতে।

প্রচলিত প্রতিটি সংজ্ঞা এবং ভাবনার বিপরীত সত্য হলে কী হতো এই জিজ্ঞাসা থেকেই সমাধান এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা উনিশ শতকের শেষার্ধে যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, তাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবার মতো উপাত্তের জন্ম তখনো হতে বাকি ছিল। জ্ঞানের রাজ্যে একটা নৈরাজ্যবাদের অবস্থা যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। এই পর্যায়ে আইনস্টাইনের প্রতিক্রিয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে অনুরূপ এক উৎপাদন-সম্পর্কের বিশৃঙ্খল দুর্দশায় ব্যথিত কার্ল মার্কসের অঙ্গীকারের মধ্যে : "The philosophers have so for interpreted the world. The point is to change it."

এবং এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল তথ্যে যতটা তত্ত্বে তার চেয়ে বেশি, আর সব চেয়ে বেশি epistemology বা theory of knowledge-এর ক্ষেত্রে। অপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে যা পরিবর্তন এনেছে তার মাত্রা প্রায় ক্ষেত্রেই দশমিকের অনেক ঘর ছাড়িয়ে গিয়ে, দৃষ্টিভঙ্গী বা মানে যে পরিবর্তন এনেছে তা ইওরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে Bacon এবং Descartes-এর দুই ভিন্ন ধারার সম্মিলনের পরিণামের সামিল। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার দিকে বড়ো একটা না গিয়েই সাধারণভাবে এর স্বরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে। বস্তুর হাজারো গুণাগুণ বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতায় আসে। তার বর্ণালী, তার ভর, বিদ্যুৎ, উষ্মা এবং অনেক কিছু। বিশেষ বলের প্রয়োগে তার চলার পথটুকু পর্যন্ত। এ-সব লক্ষণ বা গুণই বাস্তব অভিজ্ঞতায় আসে যন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এদের প্রত্যেকটার সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এমন একটা অবস্থা বস্তুর স্বরূপ—এই কল্পনাটুকু বিজ্ঞানীর নিজস্ব। এই প্রকল্পেরই নাম 'থিয়োরি' ; কিন্তু এইখানেই বিপদের প্রথম সংকেত। বিজ্ঞানী তাঁর প্রকল্পের নির্মাণকালে স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহার করতে বাধ্য, যার সত্যাসত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতীত, অথচ মিথ্যা মনেও হয় না, অনেকটা কান্ট-এর a prioric category-র মতো। আর স্বতঃসিদ্ধগুলোর সংখ্যা যদি সম্ভাব্য ন্যূনতম সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে, বুঝতে হবে থিয়োরী অসম্পূর্ণ—কারণ প্রকৃতির রাজ্যে উদ্যোগের মতো নিয়মেরও বাহুল্য নেই, কোথাও অনাবশ্যকের আবির্ভাব নেই। জড়প্রকৃতির বাস্তবের এই সহজিয়া-সাধন যে তার সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, দেসকার্তসের প্রথম নীতির মতো, একেই একটা প্রথম নীতি ধরে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর যে একটা রূপান্তর এসেছে,

তারই নাম আপেক্ষিকতাবাদ। 'সাবজেকটিভ' আকাশকুসুম এড়াবার তন্নিষ্ঠতায় এর সৃষ্টি, স্রষ্টা আইনস্টাইন।

অর্থাৎ, পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়-প্রয়াস প্রকৃত প্রস্তাবে তন্নিষ্ঠতারই অনুসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের রাজ্যে এই 'মনিজম'-এর আস্পৃহা সমকালীনদের মধ্যে একটা বিপ্লবের মতো এসেছিল। কিন্তু জন্মসূত্রে আপেক্ষিকতাবাদ কোনো বিপ্লব, না, পূর্বসূরীর সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি? আইনস্টাইনের নিজের কথায় এর উত্তরের সন্ধান এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পদার্থবিদ্যার অনিশ্চয়তা এবং অহং-বাদ (ego-centricity) নিরসনে এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করেই এই ক্ষুদ্র রচনার উপসংহার টানা যাবে।

অবশ্যই কয়েক শতকের গণিত এবং বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির মধ্যে আপেক্ষিকতার যে পটভূমি বিধৃত হয়ে আছে, সেই বিপুল বিজ্ঞানের ইতিহাস এক্ষেত্রে উল্লেখ্য নয়। 'Mein weltbild' পুস্তকে আইনস্টাইনের নিজের অভিভাষণ সংকলিত করে, আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবিতার যে প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের ভিত্তিতে, জনসাধারণের একাংশে প্রচলিত একটা ভ্রান্তির নিরসন—অর্থাৎ, আপেক্ষিকতা যে 'সিনথেটিক থিয়োরি' নয়, এর সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য প্রচ্ছন্ন হলেও বর্তমান ছিল এর উপাদান বা 'ক্যাটিগরি'র মধ্যে, এবং সেই-অর্থে এও যে একটি বিশ্লেষণাত্মক (এ্যানালিটিক) থিয়োরি, এই বিবৃতির বাইরে এই রচনার কোনো লক্ষ্য নেই। এখন কিছুক্ষণ আইনস্টাইনের নিজের কথাই শোনা যাক : "The Theory of Relativity may indeed be said to have put a sort of finishing touch to the mighty, intellectual edifice of Maxwell and Lorentz, inasmuch as it seeks to extend field physics to all phenomena, gravitation included.

"Turning to the Theory of Relativity itself, I am anxious to draw attention to the fact that this theory is not speculative in origin ; it owes its invention entirely to the desire to make physical theory fit observed facts as well as possible. We have here no revolutionary act but the natural continuation of a line that can be traced through centuries."

অনেক সময়েই একটা কথা শোনা যায় যে, আইনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় দেশ-কালের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছেন। 'দেশ এবং কালের একটা সম্পর্কস্থাপন'—বিজ্ঞানের ছাত্র নন এমন অনেকেই আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে

এ সংবাদ জানেন। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা জানা হয়ে যায় তাঁদের তা কিন্তু কল্পিত কাহিনীর নামান্তর। পাঁচজনের প্রচারের যে একটা মত্যাভাস সৃজনশক্তি আছে, ন্যায়শাস্ত্রে যাকে 'লৌকিকলক্ষ' এবং Bacon থাকে 'Idol of the Marketplace' বলেছেন, এই ভ্রান্তির উৎস হিসাবে তাকেই চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে, এই ধরনের অদ্ভুত কিছুতে বিশ্বাস করবার একটা জটিল জিদ আমাদের সকলেরই কম বেশি আছে। কাজে-কাজেই আমরা বেশ ফলাও করে বলে থাকি, আইনস্টাইন একজন ভাবুক কবি ছিলেন। পরীক্ষাশালার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল না। ইতিহাসের ধারাকে তিনি অস্বীকার করে, নিজের একটা ধ্যানের জগৎ নির্মাণ করেছেন, এবং হয়তো বা, উর্ণনাভরচিত আপন জালে আপনি বদ্ধ হয়ে, কিংবা কস্তুরীমৃগসম আপন গন্ধে আপনি মুগ্ধ হয়ে, বাস্তবের প্রতিরূপসদৃশ এক ভাবলোক রচনা করেছেন, যার সঙ্গে পরমাণুবিজ্ঞানী বা নতুনতর কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিওরির সমন্বয় একটা নিরর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র।

এই জাতীয় ধারণাগুলোর কয়েকটি নির্দোষ অজ্ঞান এবং অবশ্যই শেষের কথাগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার মাত্র। মন-গড়া একটা প্রকৃতি নয়, বাস্তব প্রকৃতির ব্যাখ্যানের দায়িত্বই নিয়েছিলেন আইনস্টাইন। ইন্দ্রিয়ের প্রমাণগুলোর অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিজ্ঞতার অপনয়ন নয়, তাদের একটা 'ইউনিটারি' চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করার উচ্চাশা নিয়েই, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে এই মহাবিজ্ঞানী তাঁর সাধনা শুরু করেন। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম পত্র প্রকাশ পায়। তার পর ১৯১৩ সালে বোর এবং ১৯২৫ সালে হাইজেনবার্গ পরমাণু-বর্ণালী এবং পরমাণু-বলবিদ্যা বিষয়ে যে দুই রাজপথের সন্ধান দেন, তাদের প্রকৃত পথিকৃৎ ছিল আইনস্টাইনের কৃতনিশ্চয় আস্থা যে 'থিয়োরি'র ভিতর পর্যবেক্ষণের অযোগ্য কোনো ধারণাপ্রসূত পরিমাণ যেন না এসে পড়ে। বোরের থিয়োরীতে যে-টুকু কল্পিত চিত্র ছিল, হাইজেনবার্গ সেটুকুও দূর করেন। পরমাণুবিজ্ঞানের রক্ষাকবচের মতো, ধন্বন্তরীর মতো যে Quantum Mechanics আজ শাখা-প্রশাখায় এতদূর বিস্তীর্ণ হয়েছে, তারও প্রেরণার উৎস ছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক তত্ত্বটুকু। আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে 'সাবজেকটিভিটি'র অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর, কারণ এর একমাত্র লক্ষ্যই ছিল 'অবজেকটিভিটি'।

Fichte-র মতো চিন্তার জগতে যাঁরা একঘরে, তাঁদেরই মধ্যে আত্মগত

ভাবনার প্রাধান্য থাকে। তাঁদের পদ্ধতি এবং প্রামাণ্য—কোনটাই কোনো ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত হয় না। অধিবিজ্ঞানে যে 'Coherence Theory of Truth' নিয়ে আলোচনা থাকে, তার মধ্যেও প্রণিধানযোগ্য একটা দিক আছে। পূর্বসূরীদের সঙ্গে, অনুরূপ ক্ষেত্রের চিন্তানায়কদের সঙ্গে, যখন আমার চিন্তার মিল বা ক্রমটুকুই খুঁজে পাই না, তখন নিজেকে দিকপাল না ভেবে ভ্রান্ত ভাবলেই ভুলের সম্ভাবনা কম হবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব হঠাৎ আকাশ-থেকে-পড়া কোনো apotheosis নয়, শোপেনহাওয়ারের 'the world is my idea' গোছের কিছু নয়—অথবা, গণিতে পারদর্শী অথচ অন্তরে এবং মনের গঠনে রোমান্টিক কোনো স্রষ্টার তথাকথিত esemplastic কল্পনা নয়। এবং নয় বলেই, তা একটা উটকো বিস্ফোরণের আকারে না এসে, এসেছে নিশ্চিত ধাপে-ধাপে, যার প্রতিটি পদক্ষেপের পশ্চাতে আছে Newton, Leibniz, Maxwell, Lorentz প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অপূর্ণ ইচ্ছার অসহিষ্ণু প্রেরণা ; Gauss, Hamilton, Riemann, Minkowski, প্রমুখ গণিতবিদদের কথিত বাহ্য-প্রকাশের ব্যাপারে অর্থহীন অথচ অব্যক্ত ধ্বনির মতো গম্ভীর ভাবেভরা ভাষা। এ তত্ত্ব এই কারণেই 'অবজেকটিভিটি' এবং 'রিয়ালিষ্টিক' বলে মনে হয়।

লরেনৎস যখন ম্যাক্সওয়েলের electro-magnetic field equation-এর সাহায্যে electro-dynamico-এর সুন্দর 'ইকোয়েশন' এবং তত্ত্ব খুঁজে পেলেন, তখন একটা সমস্যা দেখা দিল যে, আলোকের গতিবেগের স্থিরতা কেন machanicsএও প্রযুক্ত হবে না? প্রকৃতি কি বিদ্যুৎ-চুম্বকের জন্য এক তত্ত্ব এবং জড়ের গতি-বিজ্ঞানের জন্য আর এক তত্ত্বের প্রয়োগ পছন্দ করেন? এই প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর আইনস্টাইন খুঁজে পেলেন যে যুক্তি-পরম্পরার মধ্যে তাই হলো তাঁর আপেক্ষিকতার প্রথম প্রকাশ। অর্থাৎ, Special Theory of Relativity, কোনো বৈপ্লবিক আবিষ্কার নয়, সমকালীন বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক অনুক্তপূরণ। কিন্তু তাই বলে, তা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা এখানেও অভ্রান্ত। জৈব-বিবর্তনেও এ সত্য সন্দেহাতীত যে, self-exceeding is the nisus of self-manifestation—যে form বা species বা emergent প্রকাশ পায়, তা তার নিজের জ্যামিতিক মাত্রাতেই বদ্ধ থাকে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, ছাপিয়ে গিয়ে, নতুন emergent-এর সৃষ্টি করে। Alexander-এর Deity থেকে Bergson-র Creative Evolution সর্বত্র এই সত্য স্বীকৃত। মার্কসের চির নূতনের 'সিনথিসিস' ও কি এরই সগোত্র নয়?

এবং এই self-exceeding-এর মধ্যে এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ aesthetic value নিহিত, যদিও আমাদের attruistic value তার নগণ্য, অন্তত আমাদের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের এই স্তরে। Special theory-র একটি postulate ছিল, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত সাধারণ নিয়মগুলোই সমস্ত inertial frame-এ একরকম হবে। অর্থাৎ কোনো co-ordinate system এর linear Uniform motion-এর ওপর 'ল' বা 'ইকোয়েশন'-এর ফর্ম নির্ভর করবে না। অর্থাৎ law হওয়া চাই অবজেকটিভ। এর পরে co-ordinate system-এর rotation এবং অন্যান্য motion-ও বিবেচনা করা হয়। uniformly accelerated reference frame-এর ক্ষেত্রে অভিকর্ষক্ষেত্রের সমবায়—এই ভাবে General Theory of Relativity-র প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। অর্থাৎ, reality নয়, শুধুই observation, observer-এর state of motion-এর ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিয়েও এ-ব্যাপারটাকে আমরা সহজভাবে নিতে পারি। আমি যদি একটা দেয়াল থেকে দূরে সরতে থাকি আমার থেকে দেয়ালের দূরত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু 'measurement of one quality of the reality is not that reality'—কাজেই বাস্তবও যে আমার চেতনার সৃষ্টি তা এর থেকে বললে তর্কশাস্ত্রোক্ত fallacy of 'non sequitar দোষে দুষ্ট হতে হবে। Inertial এবং gravitational mass একই constant দ্বারা নির্দিষ্ট—এই পরীক্ষিত সত্যের কোনো ব্যাখ্যা নিউটনের গতিবিজ্ঞানে ছিল না। এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে এর প্রকৃত যুক্তিবাদী আলোচনা হয়েছে। আর এর কদর্থ যে যেভাবেই করুক, আসলে এতে যে 'সাবজেকটিভ' বা Subjective Idealism-এর প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি, তা খুব সংক্ষেপে হলেও দেখানো হয়েছে।

আসলে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বক্তব্য কী? এ তত্ত্ব যে সত্য, তা correspondence criterion দিয়েও যাচাই করা গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) বুধগ্রহের সূর্যপ্রদক্ষিণের উপবৃত্তের তলের ঘূর্ণন, (২) সৌর মহাকর্ষের ক্রিয়ায় আলোকরশ্মির পথের স্রস্তি, (৩) বিশাল নক্ষত্রদের আলোকের ক্ষেত্রে বর্ণালীর লোহিত-প্রান্তের দিকে চ্যুতি। এগুলো ছাড়া পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি তো আছেই যেগুলো special theory-র সমর্থন করে। আজ কোন physical theory তাই নিখুঁত নয়, যদি relativistic criterion বা আপেক্ষিকতার মানদণ্ড মেনে চলতে সে ব্যর্থ হয়। সর্বত্র এই

চরম স্বীকৃতির সঙ্গেই একটা বিরুদ্ধ গুঞ্জনও যে আছে, তার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

কিন্তু বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা এ লেখার এক্তিয়ারের বাইরে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কী পরিবর্তন এসেছে তারই কথায় আসা যাক। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই দিক দিয়ে শুধু পদার্থবিজ্ঞানীর জন্যে নয়, প্রকৃতি সম্বন্ধে, দেশ-কাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুমাত্রেরই কাছে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তার স্বরূপ কী, দু-কথায় তা দেখানো যায় না, তবে ইঙ্গিতটুকু দেওয়া যায়।

অহং-বাদী চিন্তানায়কদের দুটো category ছিল—theory এবং practice—অর্থাৎ বাস্তবের জগতের পাশেই তার ওপরে নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠত এই মনীষীদের ভাবের বা মননের জগৎ। Plato-র 'Nous' বা World of Idea এই জাতীয় একটা concept ছিল। অর্থাৎ, বাস্তব যা, তার চেয়ে তার সম্বন্ধে 'থিয়োরি' অন্য কিছু, বেশি বা কম, কিন্তু এক নয়। এক যে নয় তা শুধু অবিকল থিয়োরি করা দুরূহ বলেই নয়, অবিকল বাস্তবানুগ থিয়োরী মনীষীদের মনীষীরা 'poor picture' বলেই, 'থিয়োরি' এবং 'প্র্যাকটিস' মিল খেত না। '…অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' কিংবা, 'the real Trojan War was that which was recounted by Homer'—এই সব আপ্তবাক্যে এই বাস্তব-বিধর্মী আদর্শেরই প্রচার করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে বেকন প্রথম স্পষ্ট ভাষায় এই ধরনের theory-কে Idol of the Theatre বলে বিদ্রূপ করেন—অর্থাৎ, বাস্তব জীবনে যে-সব মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, রঙ্গমঞ্চে সে-সব মিলন অবলীলায় ঘটে থাকে। মনোগত 'থিয়োরি'র ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র কি বৈজ্ঞানিকের মন জানতে চায়, না বাস্তবকে জানতে চায়? আইনস্টাইন এই সত্য উপলব্ধি করেই, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবকে মাপকাঠি করে, অজস্র পরস্পর অন্বয়হীন সমীকরণের বদলে, systematic unified theory-র প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতে প্রতিভা জাহির করার সুযোগ ছাড়া আর কিছুরই হানি হবে না জেনেই। প্রকৃতির ভেতরে আশ্চর্য নিয়ম এবং শৃঙ্খলা আছে। তার নিয়ম, যা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা সে-গুলো বোঝাবার ভাষা মাত্র, তার ভেতরেও তা থাকবে—এটাই শ্রেয়। Knowing এবং Being—এদের ব্যবধান বৃদ্ধি হয়েছে কোয়ান্টাম থিয়োরির অনির্দেশ্য-বাদের দার্শনিক পরিণাম; এদের মধ্যে সেতুবন্ধনের দুরন্ত আশাবাদ—এই হল আপেক্ষিকতাতত্ত্ব। ওখানে জ্ঞানের পরাজয়ের স্বীকৃতি। এখানে জ্ঞানের নিরন্তর প্রত্যাশা। Probability-র ভিত্তিতে প্রকৃতি চলে, এই কোয়ান্টাম-প্রকল্প আইনস্টাইনের মনঃপূত ছিল না। 'থিয়োরি' এবং 'প্র্যাকটিসে'র অভিসারী সঞ্চারপথের বাইরেও তাঁর সমর্থন ছিল না। এই চিন্তারই আর এক প্রোজ্জ্বল দিগন্ত খুলে দিয়েছিল মার্কসবাদ। সে-সবের বিশদীকরণের দায়িত্ব পাঠকের মনে করে এই প্রসঙ্গের এইখানেই ছেদ টানা যাক।

জীবেন সিদ্ধান্ত

নাট্য প্রসঙ্গ

তিতাস একটি নদীর নাম

লিট্‌ল থিয়েটার কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক আলোচনা সভায় উৎপল দত্ত এই বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন যে মঞ্চে একক অভিনয়ের যুগ শেষ হয়েছে—এখন সম্মিলিত অভিনয়ের যুগ। একক অভিনয় সম্পর্কে এইরকম শমন জারী অবশ্য মানবার নয়, তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সম্মিলিত অভিনয়ের এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এ শতাব্দীতে বিশেষ করে 'আঁসেম্বল্ থিয়েটরে'র বিকাশের ফলে। আর সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'আঁসেম্বল থিয়েটরে'র উপস্থাপনায় লিট্‌ল্ থিয়েটর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন। 'অঙ্গারে'র সাফল্যের পর সেই পর্বে 'তিতাস একটি নদীর নাম' আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা অঞ্চলের তিতাস নদীর তীরবর্তী মৎস্যব্যবসায়ী মালো জাতির জীবন অবলম্বনে রচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেছেন এঁরা। মৎস্যব্যবসায়ীর জীবনের উপস্থাপনায় এঁরা ত্রুটিবিহীন বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের উৎসব-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার-বিশ্বাস, কলহ-ভালোবাসার চূড়ান্ত বিশ্বাস্য রূপায়ণে মঞ্চের ওপরে নাগরিকদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দূরের জগতের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রামাণ্য চিত্র দৃশ্যমান হয়েছে। নাগরিকের 'ইন্‌হিবিশন'কে বর্জন করে সমগ্র অভিনেতৃ-সম্প্রদায় যে ভাবে চূড়ান্ত পরিশ্রম ও সাধনার সঙ্গে গ্রামীন কায়িক শ্রমজীবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মসমীকরণে সমর্থ হয়েছেন তার ফলে মঞ্চের উপর মানুষের নিছক শারীরীক শক্তির একটা সম্মিলিত জীবন্ত প্রতিমূর্তি লভ্য হয়েছে—শুধুমাত্র সেই কারণেই এই নাট্যপ্রচেষ্টা প্রশংসা পেতে পারে। সম্মেলক অভিনয়ের ক্ষেত্রে কালীপূজার মেলার দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একক অভিনয় সম্পর্কে বিরূপতা সত্ত্বেও, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, নীলিমা দাস এবং স্বয়ং উৎপল দত্ত অভিনয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং উৎপল দত্ত আরেকবার প্রমাণ করেছেন যে কমেডিধর্মী অভিনয়ে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মঞ্চস্থাপত্যের প্রতি 'লিট্‌ল থিয়েটরে'র "মনোযোগ" চিরকালই প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। 'তিতাস'-এর মঞ্চসজ্জায় ও আলোকসম্পাতেও তাদের "মনোযোগ" প্রখর—এবং সম্ভবত তা ভবিষ্যতের অনেক বাগবিতণ্ডার উৎস। বিশাল জীবনকে উপস্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে এরা মঞ্চের সীমাকে সম্প্রসারিত করেছেন। জাপানী কাবুকীমঞ্চের আদর্শে মঞ্চের সামনের করিডোরে পাটাতন ফেলে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে পথ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রস্থান ও প্রবেশপথ হিসাবে দর্শকদের প্রবেশপথকে ব্যবহার করার ফলে এবং ঐ পাটাতনের ওপর অভিনয়ের ফলে ড্রামাটিক এক্‌শনের ক্ষেত্র মঞ্চের সীমাকে অতিক্রম করে দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগকে অনেকে যাত্রার পুনর্জন্ম ভেবে তুষ্ট হয়েছেন অনেকে আবার বিরক্তিবোধও করেছেন। কিন্তু এ পদ্ধতির পূর্বতন আদর্শ যাই হোক না কেন, সুপ্রশস্ত নাট্যভূমি হিসাবে এই পথ অবলম্বন অপ্রযুক্ত হয় নি। মঞ্চের অভ্যন্তরে স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ সরলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাঁশ ও খড়ের সাহায্যে রাম কেশবের ঘর ও আঙিনার সাঁকো তৈরী হয়েছে মোটামুটি ন্যাচারালিষ্টিক্ আদর্শে। পশ্চাৎপটে সাদা পর্দায় তাপস সেনের আলোকসম্পাতে নদীতীরের ও আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, মেলার দৃশ্যে এবং পাগল কিশোরের স্মৃতি ফেরাবার প্রচেষ্টার দৃশ্যে সাদা পর্দায় 'কালার প্যাচেস'-এর ব্যবহার চমৎকার 'এফেক্ট' তৈরি করেছে। নদীবক্ষে নৌকায় সুবলকে খুন করার দৃশ্যে আলো-আঁধারি মায়ার সৃষ্টি আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় নি। রামধনুর দৃশ্যটিতে একটু খেলোমির ছাপ আছে। রাস্তাঘাটের দৃশ্যে 'প্লেইন কার্টেনে' অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চের অভ্যন্তরে বাস্তবানুগ দৃশ্যসজ্জায় অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে একটু সচেষ্ট হতে হয়, তবে উপস্থাপনার নিছক শক্তিমত্তাতেই শেষ পর্যন্ত সেই বৈপরীত্য গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তবে সব মিলে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত অভিনয়ের পক্ষে কার্যকরী হলেও এবং লিটল থিয়েটরের পরিচিত গুণপনার সাক্ষ্য বহন করলেও 'অঙ্গার' বা 'ফেরারী ফৌজে'র তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চস্থাপত্যকে গুণগত বিচারে অতিক্রম করেছে মনে করবার কোনো কারণ নেই।

নির্মল চৌধুরীর লোকসঙ্গীত এবং ঢাক ঢোলের বাজনা পরিবেশ রচনায় বিশেষ সহায়তা করেছে। কিন্তু মেয়েলী উৎসবের দৃশ্যে 'প্লে ব্যাক্'-এ কোনো আধুনিক গায়িকার কণ্ঠের গানের কৃত্রিমতা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক মনে

হয়েছে—এ ত্রুটি লিটল থিয়েটারের কাছে প্রত্যাশিত নয়। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণে দু-একজনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব স্পষ্ট হয়েছে।

এপিসোডিক দৃশ্যবিন্যাসে চলচ্চিত্র নাট্যের গতির আদর্শে প্রাণবন্ত মানব-দলিল রচনার কৃতিত্ব 'তিতাস'-এর জন্য লিটল থিয়েটরের প্রাপ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু একথা সেই সঙ্গে স্মর্তব্য যে মূলকাহিনীর অংশটি সে দলিলের উজ্জ্বল অংশ নয়—বরঞ্চ মহাজনের অত্যাচার, মেলার দৃশ্য, মালো রমনীর কলহ, উৎসব, ওঝার ঝাড়ফুঁক, মালো যুবকের ঈর্ষা ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড রূপায়ণেই উজ্জ্বলতা প্রকট এবং মূলকাহিনীতে সেন্টিমেণ্টাল মেলোড্রামা বর্জন করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব না হওয়ায় একটা অতৃপ্তি থেকে যায়।

অসামান্য প্রযোজনা শক্তির অধিকারী হয়েও লিটল থিয়েটর যদি নাটক নির্বাচনে আরো সাহসী এবং গতানুগতিকতার পরিপন্থী না হন, তবে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত ফসল ফলবে না।

ধ্রুব গুপ্ত

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীবিদ্যুৎ মিত্রের 'অভিযান' সম্পর্কিত আলোচনাটি যথেষ্ট আনন্দদায়ক। এ ছবিকে যারা সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে মনে করেন এযাবৎ তাদের কাছ থেকে superlative-সম্বলিত উচ্ছ্বাসবাক্য ছাড়া সুনিশ্চিত বক্তব্য বিশেষ কিছু শুনিনি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ লেখা যথেষ্ট অর্থবহ।

এবারে আমার পক্ষ থেকে জবাব দেবার চেষ্টা করি।

প্রথম কথা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বিনাটকীকৃত গভীরতা (অত্যন্ত সংহত নাট্যমুহূর্ত কিন্তু এ ছবিতে আছে) আর 'অভিযানে'র সংঘাতময় নাটকীয়তার পৃথকীকরণে আমাকে কোনো "অসুবিধা"র সম্মুখীন হতে হয়নি। অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘটনাবহুল অথচ ভাবগভীর ছবি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ('পটেমকিন' 'সেভেন্থসীল' বা 'এসেজ্ এণ্ড ডায়মণ্ডস্'-এর নাম করছি)। দ্রুতগতির প্রতি আমি স্বভাবতই বিরক্ত নই। কিন্তু এ সব তো প্রকৃতিগত কথা, গুণগত কথা তো নয়! আমার বক্তব্য 'অভিযানে'র "নিটোল কাহিনী"র অভ্যন্তরে কোনো ভাবের সংঘাত প্রত্যাশিত গভীরতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি।

শ্রীমিত্রের মতে সত্যজিৎ রায় নরসিংকে কায়িক শ্রমজীবীর প্রতিভূ করতে চাননি, তাকে সেই শ্রেণীর নৈতিকতার প্রতিমূর্তি করতে চেয়েছেন, এবং 'অভিযান' ছবির উদ্দেশ্য "depiction of proletarian ethics." সত্যজিৎ রায়ের জীবনদর্শন সম্পর্কে আমার যতদূর ধারণা তাতে আমার মনে হয় না বিশেষ কোনো শ্রেণীর নীতিবোধের সঙ্গে participation তাঁর অন্বিষ্ট—শ্রেণী-চেতনাতিক্রামী মানবত্ববোধই তাঁর চৈতন্যে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায় বলে আমার বিশ্বাস। এ ব্যাপারে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কথোপকথনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যাই হোক, যদি মেনে নেওয়া যায় যে 'অভিযান' ছবির উদ্দেশ্য শ্রমজীবী শ্রেণীরই নৈতিকতার প্রতীকী রূপায়ণ তবে কতগুলো বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রেণীবিশেষের চেহারাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে শ্রেণীগত নৈতিকতার প্রতীকী রূপ দেওয়া যেতে পারে কাহিনীর naturalistic বিন্যাসকে অগ্রাহ্য করে বাস্তবাতিক্রান্ত কোনো বিমূর্ত রূপের

মধ্যে। 'অভিযানে'র সে-রকম দাবি থাকতে পারে কি? 'অভিযানে' archetype সৃষ্টির উদ্দেশ্য সত্যজিৎ রায়ের ছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু সরল কাহিনী বর্ণনায় নরসিংহের চরিত্রে কোনো আর্কিটাইপ হবার সফলতা নেই। প্রতাপ সিংহের উল্লেখ বা ট্যাক্সীর গায়ে অশ্বারোহীর ছবি 'মিলিউ' রচনার কাজে সুনির্বাচিত 'ডিটেইল'-এর কাজ করেছে বটে, কিন্তু তার ফলেই যে নরসিংহের চরিত্র কোনো প্রতীকী মূল্য অর্জন করেছে একথা মানতে পারি না। লাইটারকে একটা 'ডিভাইস' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ওর মধ্যেও কোনো অসামান্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অপর পক্ষে গোলাবী-উদ্ধার পর্বে অশ্বারূঢ় নরসিং-এর ছবিতে নরসিং-এর ভাবনাকে দৃশ্যমান করার মধ্যে কিছুটা crudity এসে পড়েছে। গোলাবীর সঙ্গে প্রেম-পর্বের মধ্যে যে উগ্র বাস্তবতার রূপায়ণ প্রত্যাশিত ছিল তাকে বেখাপ্পাভাবে মোলায়েম করা হয়েছে রূপকথাশ্রয়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন এ ছবির নায়কের চরিত্রে সৎ লোকের বড়ো হবার প্রচেষ্টার সমস্যাকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রে এই চরিত্রের সঙ্গে শ্রেণীনির্বিশেষে আমাদের সকলেরই একাত্মতার অবকাশ আছে। আমার মনে হয় 'অভিযানে'র অন্বিষ্ট ছিল তাই। একথা যদি সত্য হয় তবে কিন্তু বিশেষ শ্রেণীগত নৈতিকতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে ওঠে। বরঞ্চ তখন সামগ্রিক মানবিকতার প্রশ্নই আসে যাকে বিদ্যুৎবাবু হয়তো 'বুর্জোয়া লিবারালিজম' বলবেন। আমার মতে সামগ্রিক মানবিকতার ব্যঞ্জনার যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা অপু-চিত্রত্রয়ে বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় লভ্য তা 'অভিযানে' অনুপস্থিত, আর তাকে উপস্থিত করতে হলে যে শ্রেণীর চরিত্রকে অবলম্বন করে সেই মানবত্ববোধ প্রতিভাত হবে, তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রাথমিক প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কি সামান্য, কি বিশেষে 'অভিযান' আশানুরূপ তাৎপর্য সৃষ্টি না করে নিছক well-made brilliant narrative-এর পর্যায়ে থেকে গেছে।

অন্তরে গভীরতা না থাকলে উচ্চাঙ্গের হিউমার সৃষ্টি সম্ভব নয়, এবং সত্যজিৎ রায়ের আন্তরিক গভীরতা এবং হাস্যরসসৃষ্টির নৈপুণ্য তর্কাতীত—এসব "ট্রুইজমে"র পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য হলো 'অভিযান' ছবিতে কি পাওয়া গেছে। "নিম্নতম শ্রেণীর লোকের পক্ষে উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহনের ইচ্ছাটাই হাস্যকর"—এ-জাতীয় মারাত্মক জেনারালাইজেশনে আমার কোনো

সমর্থনই নেই। এইখানেই আমি প্রাসঙ্গিকভাবেই 'অযান্ত্রিকে'র কথা উল্লেখ করছি। একথা অনস্বীকার্য যে দুটি ছবির পার্থক্য বিস্তর—একটি শেষ পর্যন্ত a compassionate study of obsession-এ দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আরেকটি একটি বলিষ্ঠ সুস্থ লোকের জীবনসংগ্রামের স্বাভাবিক কাহিনী। কিন্তু "বিমলে"র জীবনেও 'বাবুশ্রেণী'র সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নটি নিতান্ত নগণ্য নয় এবং বিশেষ করে ভদ্রশ্রেণীর একটি মেয়ের প্রতি তার দ্বিধাবিভক্ত চিত্তের সশঙ্ক আচরণের irony চিত্তআলোড়নকারী। ট্রেনের টিকিট হাতে জানালা অনুসরণ করে বিমলের ছোটার দৃশ্যে ইঞ্জিনের শব্দে মেয়েটির শেষ কথা শুনতে না পাওয়ার মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে তার তুল্য গভীরতা 'অভিযান'-এ লভ্য হয়নি। আমি এখানে গুণগত তুলনা করছি, প্রকৃতিগত তুলনা করছি না, ঠিক যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সঙ্গে 'অভিযানে'র গুণগত তুলনা করছিলাম। বিমলের চরিত্রে যে "deeper level of personality" উদ্ঘাটিত হয়েছে নরসিং-এর চরিত্রে আমি তা পাইনি। জগদ্দল সম্পর্কে সমস্ত আশা নির্মূল হবার পর "লোহার বাচ্চা" বলে বিমলের আর্তনাদ ও পাথর দিয়ে তাকে আঘাত করার মধ্যে যে অস্তিত্বের মূল কাঁপানো হাহাকার আছে তার তুলনায় অভিযানে 'কেরাইসলারে'র গায়ে ঢিল মারা বা যোশেফ্‌কে চড় মারার দৃশ্য অনেক রক্তশূন্য বলে মনে হয়—যেমন রক্তশূন্য মনে হয় মারামারির দৃশ্য। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়ার কান্নার তারসানাই-এর সাঙ্গীতিক রূপায়ন, 'অপরাজিত'তে হরিহরের মৃত্যুতে উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক এবং সর্বজয়ার 'কি হোল' আর্তনাদ; এমনকি ভিন্নপ্রকৃতিতেও কাঞ্চনজঙ্ঘায় নিঃসঙ্গ ধূসরতায় লাবণ্যের কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত—এই সব অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ঐ মৌলিক হাহাকার চিত্রস্থায়ী রূপকল্পে নিবদ্ধ আছে—এমনি অনেক মৌল আনন্দের প্রকাশ সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির অনেক উজ্জ্বল মুহূর্তে ঘটেছে। অভিযানে ঐ প্রকারের উজ্জ্বল মুহূর্তের একান্ত অভাব লক্ষ্য করেছি। বিদ্যুৎবাবুর বর্ণিত চিত্রাংশগুলির কোনোটিই উপরিলিখিত চিত্রাংশের তুল্য গভীর বলে আমার মনে হয় না।

বিদ্যুৎবাবুর 'প্রলেতারিয়া মরালিটি'র বিশ্লেষণ করলে এই রকম দাঁড়ায়—একজন শ্রমজীবী ইংরেজী শিখে ভদ্দরলোক হতে চায়—সেটা খুব হাসির ব্যাপার—ভদ্দরলোকদের সঙ্গে অত মাখামাখি ভালো নয় বাপু, নীতিভ্রষ্ট হবে। এবং শেষপর্যন্ত দেখলে তো মজা—ভদ্রকন্যা তোমাকে ছেড়ে দেড়খানা পা-

ওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেল তোমারই সাহায্য নিয়ে! এই অংশটি ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ, কিন্তু এর 'বিটার আইরনি'কে অব্যবহিত পরেই তরলীকৃত করা হয়েছে লঘু হাস্যপরিহাসে গোলাবীর সঙ্গে আলাপে। ভদ্রলোকদের বদ্ ব্যবসার ফাঁদে পা দিয়ে তোমাকে পাপের পথে পা বাড়াতে হলো—বন্ধুরা তোমায় ত্যাগ করলে। শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চাষবাষ করোগে। অবসরমত গাড়ী চালিও! এই কি প্রলেতারিয়া নীতিবোধের জয়ের নমুনা! এই কি অপ্রতিহত 'অভিযান'? আমি 'অভিযানে'র বিষয়বস্তুকে অতি লঘু বা সংকীর্ণ করে দেখতে রাজি নই— এই-জাতীয় বিচারে পরশপাথরের মতো বুদ্ধি দীপ্ত কমেডির নায়ক পরেশবাবুকে হয়তো পেটি বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতীক বলে ঘোষণা করা হবে এবং ঐ ছবিকে ব্যাখ্যা করা হবে পেটি বুর্জোয়ার উচ্চবিত্ত হবার মোহ ভঙ্গের পর নিজস্বশ্রেণীগত 'নৈতিকতা'র জয়ের রূপায়ন হিসাবে। ঐ ধরণের "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা"র মানদণ্ড প্রয়োগ করেই 'পরশপাথর' সম্পর্কে এক সমালোচক সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে এতে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে স্থূথী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে! তা ছাড়া— আমার অভিযোগ রূপায়নের লঘুত্ব সম্পর্কে—যে জন্য আমার কাছে শেষ দৃশ্যটি নিছক নিটোল গল্পের সুখী পরিসমাপ্তি ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য বহন করেনি।

তা ছাড়া গিরিবর্জায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারকে "প্রলেতারিয়া নৈতিকতার জয়" বলে ব্যাখ্যা করার বিপদ আছে। 'সেমি-আরবান লেবার'কে 'রুরাল এগ্রিকালচারে" ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় কেউ যদি সত্যজিৎ রায়ের "সামাজিক বাস্তবতায়" পিছুটান আবিষ্কার করেন? আমি ঠাট্টা করছিনে— শিল্পকর্ম ব্যাখ্যায় এ-জাতীয় বিচারের আদর্শে আমার খুব আস্থা নেই।

'অভিযান' ছবির অনেক গুণ আছে—এবং এ-ছবি শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়েরই মহৎ শিল্পকর্মের এবং 'অযান্ত্রিকে'র মতো মহৎ ছবির তুলনায় খাটো। আমরা অধীর আগ্রহে 'মহানগরে'র অপেক্ষায় আছি সে ছবিতে আমাদের নাগরিক জীবনের আনন্দ বেদনার সুমহান রূপায়নের স্থির আশা নিয়ে।

ধ্রুব গুপ্ত

পু স্ত ক প রি চ য়

The Modern Prince and other Writings—Antonio Gramsci. Publisher—Lawrence & Wishert.

এ্যানটোনিয়ো গ্রামচি ছিলেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ্ গ্রামচি ফাসিস্ট মুসোলিনির কারাগারে একাদিক্রমে ১১ বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগ করে জেলের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনিই ছিলেন ইটালির সর্বপ্রথম মার্কসবাদী।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এ্যান্টোনিয়ো গ্রামচি ইটালিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। ১৯২৬ সালের ৮ই নভেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল কারাগারের অভ্যন্তরেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। এই সুবিখ্যাত দার্শনিক—যাকে বেনেডিটো ক্রোস্ দার্শনিক পাণ্ডিত্যে টমাস একুইনাস এবং ব্রুনোর সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছিলেন— সেই বিশ্ববিখ্যাত পরমজ্ঞানী গ্রামচি ইটালিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব করে মার্কসের একটি সুবিখ্যাত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন—সেই উক্তিতে মার্কস বলেছিলেন যে: "এতকাল দার্শনিকদের কাজ ছিল জগতের অর্থ ব্যাখ্যা করা, এখন থেকে তাঁদের কাজ হলো কেবল অর্থ ব্যাখ্যা নয়, জগতের পরিবর্তন ঘটানো।"

এ্যান্টোনিও গ্রামচির 'আধুনিক মহারাজ এবং অন্যান্য লেখা'য় মার্কসবাদের সারমর্ম অনুধাবনে এবং তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগে গ্রামচির অসামান্য প্রতিভা যে-কোনো পাঠককে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করতে বাধ্য। সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের সংগে মতান্ধতার কোথায় পার্থক্য তা বুঝতে হলে গ্রামচির লেখা পড়তেই হবে।

মার্কসবাদী তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সারমর্ম উদ্ঘাটিত করে গ্রামচি লেখেন:

"নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির অর্থ কেবল কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক "মৌলিক" আবিষ্কার নয়। তাছাড়াও তার বিশিষ্ট অর্থ হলো সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে আবিষ্কৃত সত্যের প্রচার, বলা যেতে পারে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের "সামাজিকীকরণ" এবং তার ফলে তা যাতে জীবন্ত কর্মের ভিত্তি হতে পারে, তা যাতে

সামূহিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় এবং তা পরিণত হয় চিন্তার ও নৈতিক জীবনের উপাদানে, তারই ব্যবস্থা করা।”

এই একটি মন্তব্যের ভিতর দিয়েই গ্রামচি সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির একটি কর্মসূচির যে নমুনা দিয়ে গেছেন তা সর্বদেশের এবং সর্বকালের প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদদের জন্য সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিত।

আজ যখন সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদ তথা মতান্ধতার গোঁড়ামি নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে তখন গ্রামচির লেখনী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুখারিন্ কর্তৃক লিখিত ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদ” নামক গ্রন্থ এবং “ডায়লেকটিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ” নামক প্রবন্ধের সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন এই সম্বন্ধে গ্রামাটির সমালোচনা পড়ে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে তাত্ত্বিক গোঁড়ামির বা মতান্ধতার অনেক জড় বুখারিন কর্তৃক লিখিত “ঐতিহাসিক বস্তুবাদে”র মধ্যে নিহিত।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের তত্ত্ব সম্বন্ধে বুখারিনের ভ্রান্ত ধারনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে গ্রামচি বলেছেন—“... ..তিনি (অর্থাৎ বুখারিন) ডায়লেকটিক তত্ত্বের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝেন না, তিনি ডায়লেকটিক তত্ত্বকে চেতনার নীতি, ইতিহাসের সারবস্তু এবং রাজনীতির বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত করে আনুষ্ঠানিক তর্কশাস্ত্রে এবং বিদ্যাবাগীশতার ‘অ-আ-ক-খ’ য় পরিণত করেছেন। (আলোচ্য গ্রন্থ, ৯৯ পৃষ্ঠা)।

গ্রামচি যখন বুখারিনের এই সমালোচনা করেন বুখারিন তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বপদের শিখরদেশ অলঙ্কৃত করছেন। তখনকার দিনে গ্রামচির এই নির্ভীক সমালোচনা ইটালির কমিউনিস্ট পার্টিতে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল।

“ঐতিহাসিক বস্তুবাদ” নামক গ্রন্থে বুখারিন ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাববাদ (subjective idealism)-এর যে সমালোচনা করেছেন, গ্রামচি তার দুর্বলতা তুলে ধরে বলেছেন যে বুখারিন বুঝতে পারেন নি এই সমালোচনায় তিনি বাস্তব সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রহেলিকাবাদের অভিযোগ আসতে পারে। (১০৬ পৃষ্ঠা)

বুখারিনের বস্তুবাদ মার্কসবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রামচি বলেছেন—মানুষের মনের বাইরে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এই কথা প্রমান করবার

জন্য বুখারিন শুধু সাধারণ মানুষের বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাসকেই প্রধান স্থান দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর অপলাপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গ্রামচি এঙ্গেলসের যে ব্যাখ্যাটিকে প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করেছেন; সেই ব্যাখ্যাটি হলো এই :

“জগতের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে দর্শনের এবং বিজ্ঞানের দীর্ঘকালীন শ্রমসাধ্য বিকাশের ভেতর দিয়ে।”

এঙ্গেলসের এই সংজ্ঞাটির উল্লেখ করে গ্রামচি দেখিয়েছেন বুখারিনের দুর্বলতা কোথায়। বুখারিন বলেন—ইতিহাসে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পূর্বেও জগৎ ছিল, এ থেকে বস্তুই যে আদি তা প্রমাণিত হয়। গ্রামচি বলছেন যে, এই ইতিহাসও তো মানুষের মনের গোচরীভূত ইতিহাস, এমন ইতিহাস কোথায় আছে যা মানুষ তার চিন্তা দ্বারা সৃষ্টি করে নি? একজন মানুষের কাছে যে ইতিহাস বাস্তব সত্য সমগ্র মানবসমাজের সম্মিলিত চিন্তার কাছে তা বস্তুনিরপেক্ষ ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্য। সুতরাং বুখারিনের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করলে বস্তু শেষ পর্যন্ত মনের ওপর নির্ভরশীলই থেকে যায়। তাহলে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ সত্যের অস্তিত্ব কি করে প্রমাণিত হয়?

এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাটি পরীক্ষা করে গ্রামচি দেখিয়েছেন যে দার্শনিক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এই দুয়ের সমবেত ফলস্বরূপ বস্তুর বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হলো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দৈহিক মিলনের ফল। দার্শনিক গবেষণা চিন্তা দ্বারা সেই ফলটিকে যাচাই করে। আবার দার্শনিক চিন্তার ফলটিও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করা হয়। এই দুয়ের ফল যখনই মেলে তখনই বস্তুর বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয়।’ তখন ‘র‍্যাশনাল’ এবং ‘রিয়েল’ এই দুয়ের মিলন ঘটে। “এই দুয়ের সম্বন্ধটি না বুঝলে মার্কসবাদ আদৌ বোঝা হয় না।”

গ্রামচি আরও অনেক আলোচনা করেছেন বুখারিনের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যে অতীতকালের বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনকে যে-রকমভাবে তিনি নেহাৎ মূর্খতার নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন তা মার্কসবাদী পর্যালোচনার বিরোধী।

মেকিয়াভেলির ‘মডার্ণ প্রিন্স’ আলোচনা করে গ্রামচি মার্কসবাদী তত্ত্বের সংগে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে অতীতকালের দর্শনের মধ্যেও বর্তমান কালের মার্কসবাদের জড় নিহিত আছে, সুতরাং সত্যের

উৎস তাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। অতীতের কোনো ভাববাদী দর্শনও একেবারে মিথ্যা বা মূর্খতার নজির নয়।

সমাজের বিকাশ এবং সামাজিক বিপ্লবের আলোচনায় গ্রামচি মার্কসবাদের মূলতত্ত্বটি অতি সংক্ষেপে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে যতক্ষণ না পুরাতন সমাজের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজবিপ্লব দেখা দেয় না, ভাবী সমাজের বীজ যতক্ষণ না বর্তমান সমাজের ভিতর পরিণতি লাভ করে ততক্ষণ নূতন সমাজের আবির্ভাব ঘটে না (১৬৫ পৃঃ)। এমনও হয় যে দীর্ঘকালীন সংকটের মধ্যেও সমাজটা বহুকাল টিকে থাকছে, তখন বুঝতে হবে যে বর্তমান সমাজের কর্ণধারগণ বর্তমানের মধ্যেই সংকট সমাধানের সংগ্রাম চালাচ্ছেন এবং তার ফলে সাময়িক সমাধানও ঘটছে।

'মডার্ণ প্রিন্স'-এর বিশ্লেষণসূত্রে গ্রামচি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মূল্যবান সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। মানুষের চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়, যাকে বলা হয় 'পারস্পেকটিভ', বাস্তবক্ষেত্রে তার অবিকল প্রতিরূপ কখনও আবির্ভূত হয় না। চিন্তা দ্বারা মানুষ যে লক্ষ্য স্থির করে তার মধ্যে থাকে বহু নৈয়ায়িক যুক্তির সুশৃংখল সমাবেশ। বাস্তক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ঠিক তার অবিকল প্রতিকৃতি নয়। তাই চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য ঘটে এবং যেমনটি ভাবা যায় ঠিক তেমনটি ঘটে না। (১৬২ পৃষ্ঠা)

দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে, কর্মসূচি রচনায় এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে পরিবর্তনশীল জটিল জগতের সারমর্ম-উপলব্ধির প্রতি গ্রামচি অনেক জোর দিয়েছেন যাতে যান্ত্রিক পরিকল্পনা থেকে ডায়লেকটিক ভাবধারার পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে যে বহুমুখী আলোচনা আছে তা মার্কসবাদ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মহামূল্য অবদান। চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধনের তপস্যারত এই মহামনীষী ফাসিস্ট কারাগারের নির্যাতনের ভেতরও যে সৃষ্টিশীল অবদান রেখে গেছেন, তা পাঠকসমাজের সম্মুখে হাজির করে প্রকাশক আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মার্কসবাদের ছাত্রদের নিকট এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। এত সম্পদশালী লেখার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার ভেতর এর প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। আরও পর্যালোচনা এবং সম্ভব হলে, অংশবিশেষের সারানুবাদও পাঠকেরাও সত্যই দাবী করতে পারেন।

ভবানী সেন

সে নহি, সে নহি। শ্রীচাণক্য সেন : ক্লাসিক প্রেস। দশ টাকা।

শ্রীচাণক্য সেনের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সে নহি সে নহি' যখন 'প্রবাসী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন মাসের পর মাস সাগ্রহে আমি তাহার অনুসরণ করি। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস "রাজপথ জনপথ" পড়িয়া মনে হইয়াছিল বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে এই নূতন আগন্তুকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিবার মতো। দ্বিতীয় উপন্যাসখানি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল, "বহুলাংশে" পরিমার্জনার পর। আমার আন্তরিক ধারণা বাঙালী পাঠকসমাজের চিন্তাশীল বিভাগ ইহাকে অবহেলা করিবেন না।

চাণক্য সেনের বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী, যদিও তাঁহার শিক্ষাজীবন কাটিয়াছে পূর্ববঙ্গের গ্রামে ও কলিকাতায়। কর্মজীবনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কলিকাতার 'স্টেটসম্যান' ও মধ্যপ্রদেশের 'নাগপুর টাইমস্'-এ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাঁহার মনোযোগের প্রকৃষ্ট পরিচয় 'ধীরে বহে নীল'—যাহা ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সমীক্ষা হিসাবে পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে। সাংবাদিকতার এই স্তর হইতে উদ্ভূত হয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস। ১৯৬০ সালে রচিত "রাজপথ জনপথ" উপন্যাসে দেখা যায় যে তাঁহার সাংবাদিকতা ও সাহিত্যিকতা কিছুটা কাছাকাছি ভাবে জড়াইয়া আছে।

বর্তমান যুগে সকল সভ্যদেশেই কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের সহিত সাংবাদিকতার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড় হইয়া গিয়াছে। সাংবাদিকের তথ্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিকের রূপায়ন-শক্তি নিশ্চয় একই শ্রেণীর রচনা-কুশলতার নিদর্শন নয়। কিন্তু উপন্যাসকার যদি তাঁহার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেন একেবারে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি খঞ্জ হইয়া পড়ে সাংবাদিকতার সম্পূরক শক্তির অভাবে। নিছক কল্পনা দিয়া উপন্যাস রচিতে গেলে তাহার সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইয়া পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। 'সে নহি সে নহি' উপন্যাসে চাণক্য সেন তাঁহার সাংবাদিক দৃষ্টি-নৈপুণ্যের সহিত সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার সংযোগ সাধনের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন।

"সে নহি সে নহি"-র রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬১ হইতে এপ্রিল ১৯৬২। আর এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা—সাবিত্রী আম্মার সহিত দেবযাণীর নিউ দিল্লীতে সাক্ষাৎ—ঘটে ১৯৫৮-৫৯ সালে, যখন ইরাকে কাশেম-বিপ্লবের চমকপ্রদ অগ্রগতি ভারতের পার্লামেণ্টারি মহলে ভোজন-টেবিলেও আলোচনার

অন্তর্ভুক্ত। এই কেন্দ্রীয় ঘটনা হইতে গল্পের পরিসমাপ্তির কালব্যাপী ব্যবধান মাস-খানেকের বেশি হইবে না। কেবল এইটুকু বিস্তারের উপর নির্ভর করিলে উপন্যাসকার হয়তো ঘটনা পরম্পরাকে শরীরস্থ অস্থিগুলির মতো সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে না থাকিত দৈহিক লাবণ্য, না থাকিত প্রাণের প্রকাশ। গ্রন্থকার তাই তাঁহার বক্তব্যের তাগিদে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতকে। তিনি বলিতেছেন : "বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতবর্ষ এ উপন্যাসের পরিবেশ। তার সঙ্গে এসে মিশেছে বর্তমান কালের পৃথিবী। বহু মানুষের বিচিত্র ছায়া পড়েছে উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিবেশে তবু তাদের ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি প্রধান চরিত্র।" বলা বাহুল্য, সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে উপন্যাসকারের প্রধান দায়িত্ব এই প্রধান চরিত্রগুলির চিত্রনে। পশ্চাৎ-পট যতই বিস্তীর্ণ ও পরিবেশ যতই বিচিত্র হোক না কেন, উপন্যাস সাহিত্য-হিসাবে সফল হইতে পারে না যদি না তাহারা সম্পৃক্ত হয় প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়নের সহিত। শ্রীচাণক্য সেন সজাগভাবেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে প্রবাহিত দুটি নারীর জীবনধারা—তামিলনাদের সাবিত্রী আম্মা ও বাংলার দেবযাণী। দুজনের পরিচয় স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। সাবিত্রী আম্মা, গল্পের সূচনায়, জীবন-সায়াহ্নে কংগ্রেসী এম. পি স্বাধীনতা-সংগ্রামের গান্ধী-আন্দোলনে দীর্ঘকাল যোগদানের ফলে। দেবযাণীর বিজ্ঞান-শিক্ষা কলিকাতায় তবে বর্তমানে নিজের কৃতিত্বে আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না তরুণী অধ্যাপিকা। সে স্বল্পকালের জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে, দিল্লীতে উচ্চমানের বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে। উপন্যাসে এই দুটি জীবনধারা অনুসৃত হইয়াছে তাহাদের উৎসমুখ হইতে। সাবিত্রী আম্মার পিতামাতার কাহিনী, ও দেবযাণীর মাতা ও মাতামহের কাহিনী উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অধুনা প্রচলিত সিনেমাশিল্পের আঙ্গিক অনুসারে লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন অতীত সম্বন্ধে 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' ও বর্তমান সম্বন্ধে 'ক্লোজ-আপ'। আধুনিক সাহিত্যশিল্পের বহুল-প্রচলিত প্রণালীর—ভাবের অনুষঙ্গ ও স্বগতোক্তি—ব্যবহারেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দিল্লী হইতে মাদুরাই, শবরমতী ও মাদ্রাজে, কলিকাতা হইতে বাংলার পল্লীতে এবং লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে। আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজ আমলের ভারত হইতে আজ পর্যন্ত

ক্রমবর্ধমান নারী-প্রগতির সুদীর্ঘ ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে রূপায়িত করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক গতিশীলতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নারীর প্রগতি ঘটিতেও পারে না, এবং তাহার বিশেষত্বকেও উপলব্ধি করা যায় না। তাই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক দাবীতেই লেখক বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও অগ্নিযুগকে। দক্ষিণ ভারতের পশ্চাৎপদ সমাজ, থিয়োসফি আন্দোলন ও মিসেস বেসান্তকে একদিকে, ও অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকালে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও গান্ধীজির শান্তি-প্রচেষ্টা, দেশবিভাগ, ও বিভাগ-জর্জর ভারতে দেশবাসীর পক্ষে ইংরেজের হাত হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শাসনভার গ্রহণ—এ সমস্তই উপন্যাসের চলিষ্ণু প্রবাহে যথোচিত স্থান পাইয়াছে। নারীর জীবনে, ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সমষ্টিগত ভাবেই হোক, পুরুষের সমর্থন ও বিরোধিতা অনিবার্য। তাই, সাবিত্রী আম্মা ও দেবযানী উভয়কেই কেন্দ্র করিয়া দেখা যায় নানাবিধ পুরুষ চরিত্রের আবর্তন। আর নারী প্রগতি সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে নারীমাত্রেই অন্য নারীর সহায়িকা নয়, এমনকি মা ও মেয়ে সবসময়েই পরস্পরের সহানুভূতিশীল সহযোগী নয়। নর-নারীর সম্বন্ধের নানা জটিলতার রহস্য নিহিত থাকে তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের অন্তরালে অপ্রকাশ্য মানসিক সংগঠনের স্বকীয়ত্বে। এই সব জটিলতা প্রকটতর হইয়া ওঠে কোনো দেশের ইতিহাসে যখন ঘটে কোনো অভূতপূর্ব দ্রুত পরিবর্তন। ভারতের স্বাধীনতা-লাভ ও সমাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্র ঘোষণা এমনই একটি ঘটনা যাহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কেবল ভারতীয় সমাজের মরা গাঙে জোয়ার আনে নাই, সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে করিয়াছে নূতন সংযোগের ও সংঘাতের নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলন।

এই নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলনের দশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে বিশেষত্ব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে প্রায় অপ্রতিবাদ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, বুদ্ধিজীবী উপন্যাসকার হিসাবে চাণক্য সেন তাঁহার গ্রন্থে তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

"স্বদেশের রাজধানীতে সেক্রেটারিয়েট ব্যাপারটা দেবযাণীকে খানিকটা অভিভূত করেছে। ছাত্রীজীবন কেটেছিল কলকাতায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম শুনেছিল অনেক, কিন্তু একবার ছাড়া, কোনোদিন, তার সংস্পর্শে আসতে হয় নি। কোম্পানী আমলের ওই লাল ইটের বাড়ীটাকে ভালো করে

দেখে নি পর্যন্ত কোনও দিন।··· কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং না জেনে থাকা গেছে, কিন্তু দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট না জেনে, না মেনে, বাঁচবার উপায় নেই। এ শহরের প্রাণ-কেন্দ্র হলো 'বড়া দপ্তর'। সে এত বড়, এত তার দাপট, তার কাছে মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সে চলে নিজের অমোঘ নিয়মের দীর্ঘসূত্র বেতালে; আপন মাহাত্ম্যে সে মাতাল। দেবযাণী ভেবেছিল, সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবেরা বুদ্ধিমান, কর্মকুশল, দেশের জনকল্যাণ তাঁদের, একমাত্র না হোক, প্রধান কাম্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, প্রয়োজনের তাগিদে, যাঁদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে তাঁরা অন্য জাতের মানুষ। তাঁরা নিজেদের দাম বড় বেশি বোঝেন, অন্যের দাম বড় কম। তাঁরা বাস্তব থেকে দূরে বাস করেন, পৃথিবীটাকে দেখেন নিজস্ব এক কৃত্রিম দৃষ্টিতে, বিকৃত করে। তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে চান, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। বলেন বেশি, শোনেন খুব কম। সর্বদা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা যা করেন তাই ঠিক, যা করেন তা নির্ভুল। দেবযাণীর রাগ হয়, মজাও লাগে। পশ্চিমে তার দশবছর কেটেছে, কিন্তু ব্যুরোক্রাট্দের মাহাত্ম্য বোঝবার সুযোগ হয় নি। য়ুরোপ আমেরিকায় সিভিল সার্ভেণ্টদের চেয়ার ছেড়ে দিতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। ভারতবর্ষেই উপন্যাসের আদর্শ নায়ক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে রাজপুরুষের মর্যাদা আকাশ-উচু। পাশ্চাত্ত্যে সরকারী চাকুরেদের প্রতি বেসরকারী মানুষের বরং একটু প্রচ্ছন্ন অবহেলা। ওদেশের সিভিল সার্ভেণ্ট সেবক। এদেশে তারা শাসক।"

দেবযাণী ছিল রাজনীতি-নিঃস্পৃহ বিজ্ঞান-সাধিকা। কিন্তু অল্পদিনের, অভিজ্ঞতাতেই সে বিস্মিত-ক্ষোভে অনুভব করিল, সরকারের কর্তৃত্ব-মুক্ত কোনো প্রচেষ্টারই—হোক না যতই কেন উচ্চতম মানবিক আদর্শের অনুগামী ও সর্বভারতীয় জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক—সহজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিদেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইল হিমাদ্রিকে, যে তাহার জীবনে বিজ্ঞান-সাধনার উদ্‌বোধক, গবেষণা-সাফল্যের প্রধান হোতা, তাহার আন্তর-আনুগত্যের প্রধান দাবীদার। কিন্তু গান্ধীবাদী হিমাদ্রিও বর্তমানে রাজনীতিতে বিগতস্পৃহ। দেবযাণীর স্বামী-বিচ্ছিন্ন জীবনের দ্বিতীয় অবলম্বন তাহার একমাত্র সন্তান, খোকন। এই খোকনের মুখ চাহিয়াই দেবযাণী হিমাদ্রিকে সর্বাঙ্গীনভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। হিমাদ্রি তাহার মানবিকতার সমস্ত মহত্ব দিয়া খোকনের চিত্ত জয় করিয়া জননী দেবযাণীকে

পুনরায় জায়াত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল। দেখা গেল, সন্তানবতী স্নেহশীলা মাতার পক্ষে পুনরায় পতিগ্রহণে যে সব সামাজিক প্রতিবন্ধ দেবযাণীর মর্মের গভীরতম প্রদেশে আত্মসংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা সার্বজনীন নয়, সর্বকালের নয়। সমাজের একটি বিশেষ স্তরে তাহাদের গুরুত্ব; সে স্তর কাটাইয়া গেলে তাহারা নির্বিষ হইয়া পড়ে। ইহা নিঃসন্দেহ যে স্বাধীন ভারতে উন্নততর সামাজিক ভাবাদর্শের প্রভাব বাদ দিয়া হিমাদ্রি-দেবযাণী-খোকনের সম্মিলিত জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই যে একটি সুখের সংসারের উপস্থাপনা হইল, স্বাধীন ভারতের ব্যুরোক্রাট-পর্যুদস্ত পরিবেশে ইহার ভবিষ্যত কতখানি সুখের থাকিতে পারিবে, উপন্যাসকার চাণক্য সেন তাহার কোনো ইঙ্গিত তাঁহার গ্রন্থে দেন নাই। দেবযাণী-হিমাদ্রির সযত্ন-লালিত দেশসেবার কর্মপদ্ধতি—দিল্লীতে বেসরকারী উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক গবেষনাগার প্ল্যানটি ভবিষ্যতের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকিয়া গেল।

গবেষনাগার সম্বন্ধে উপন্যাসে এই অনিশ্চয়তা, আমার মনে হয়, চাণক্য সেন মহাশয়ের শিল্পচর্চায় বিবেকবত্তায় পরিচায়ক। তিনি জানেন, বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলগত প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিচারবুদ্ধি দ্বিধামুক্ত নয়। তাহারা ইহাকে দেখিতে চান সনাতন ভারতীয় সভ্যতার মানবিক ঐতিহ্যবাহী আধুনিক পরি-প্রসার হিসাবে। সাবিত্রী আম্মার মুখ দিয়া তাই তিনি বলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার একটা দুরপনেয় দায়িত্ব আছে, যা দেবযাণীও মানিয়া লইয়া ভাবেন, ভারতবর্ষ দেশ নয়, সংস্কৃতি ও সংস্কার, আমাদের রক্তের স্রোতে ধমনীতে ধমনীতে ভারতবর্ষ প্রবাহিত। কিন্তু দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি এই সনাতন ভারতবর্ষের কোনো ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। হিন্দু-সমাজ কি ভারতের সব প্রদেশে সর্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সমাজ, তাহার অভ্যন্তরে কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রের সংঘাত কখনো ছিল না, ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণ অজ্ঞাত ছিল? তাছাড়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস কি কেবল হিন্দুরই ইতিহাস? ভারতীয় মুসলমান কি কখনই ভারতীয় হয় নাই। ইহা মানিলে তো মানিতে হয় ভারত-বিভাগই ভারত-ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি? চাণক্য সেন নিজেই দেখাইয়াছেন কি ভাবে বর্তমানের কংগ্রেসী নেতারা সযত্নে পরিহার করেন এই প্রসঙ্গকে। অন্যদিকে তিনি চাহেন যে ভারতীয় রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে আধুনিক ও বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠুক। তাই তিনি হিমাদ্রি-দেবযাণীর প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতে

'সায়েন্টিফিক ম্যান' গড়িবার প্রয়াসী। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র দেবযানী বলিতেছে, বিজ্ঞানের কোনও দেশকাল পাত্র নাই; বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি নাই যে দেবযানীর এই বিজ্ঞান-আনুগত্য এক বিমূর্ত বিজ্ঞান-সাধনার প্রতিভাস কি না। অর্থাৎ যে সমাজে বিজ্ঞানের সাধনা চলিতেছে সেখানে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের চরম মূল্য নির্ধারিত সেই সমাজের চালিকা-শক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। সেই কারণেই বর্তমান বিশ্বে সকল দেশের সকল সমস্যার মূলে হইতেছে এক অবিরাম সংঘাত—সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমাজবাদের, সংঘবদ্ধ ধনশক্তির সহিত বিবর্ধমান শ্রম-শক্তির। সনাতন ভারতবর্ষের বর্তমান খণ্ডিত উত্তরাধিকারেও এ সংঘর্ষের বিরাম নাই। তাই বিজ্ঞান-প্রসারের প্রসঙ্গেও রাষ্ট্রকর্মীরা বিব্রতভাবে প্রশ্ন তোলেন—এ কোন বিজ্ঞান? মার্কিন বিজ্ঞান, না রুশ বিজ্ঞান? তাই সাবিত্রী আম্মার স্বল্পদৃষ্টি কিন্তু রূঢ়ভাষী কন্যা সরোজা দিল্লীর রাজনীতি-বিশারদদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে আদর্শবাদী তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইংরেজ চলিয়া যাওয়াতে তাহাদের মহাবিপদ হইয়াছে, লড়িবার আর কিছুই নাই।

লড়িবার আর কিছুই নাই এই মনোভাব সর্বতোভাবে প্রযোজ্য ভারতের বুদ্ধিজীবীর বেলায়। চাণক্য সেনের এই বৃহদাকার উপন্যাসের সমস্ত পটভূমি জুড়িয়া আছে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বৃহৎ ধনশক্তির প্রতিনিধি বা সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধির কেহই এই উপন্যাসে স্থান পায় নাই। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে অনবহিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রধান চরিত্রগুলির সকলকেই বর্তমান বিশ্বের মূলগত সমস্যা সম্বন্ধে অনীহা-প্রবণতার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলায় এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে হইয়াছে কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে। কনট প্লেসের এক মাঝারি অভিজাত রেস্তোরায় এক মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণে আগত কয়েকজন বিভিন্ন-প্রদেশীয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সহিত দেবযানীর আলাপ-আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ আলোচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য, দর্শন কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়ে না। এবং দেখা যায়, বক্তাদের কাহারো মতের সঙ্গে অন্য কাহারও মতের কোনো ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকে না। এই আলোচনা-পর্বের প্রায় সমাপনকালে, আমন্ত্রণকারী অধ্যাপক সমীর ঘোষ দেবযানীকে বলিতেছে:

"আমাদের সবাকার কথা শুনে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে, আমাদের বিরাট মতভেদ। কোনো দুজন ভারতবাসী সব বিষয়ে একমত নয়। আসলে আমরা সবে মাত্র চলতে শুরু করেছি। এখনও নির্দিষ্ট পথে আমরা চলছি না। দেখুন না আমাদের রাষ্ট্রীয় চেহারা: আমরা গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু এ দেশে নেতারা যত অন্ধপূজা পান পশ্চিমে তার একাংশও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র হয়েও আমরা এক এবং অদ্বিতীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কিন্তু আসলে আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের জয়জয়কার। ধনী-দরিদ্র এমন প্রভেদ আজ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে নেই। আমাদের কংগ্রেস দল সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রকে বলিষ্ঠ করছে, আমাদের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিন মুখাপেক্ষী। কমুনিস্টরা সংগ্রাম-পলাতক ভদ্রলোক। অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছুই নির্ভেজাল নয়। আমরা এখন এক বিরাট লেবরেটরী; এখানে কেবল নানা পরীক্ষা চলছে—আমরা ফুটছি—মানে সেদ্ধ হচ্ছি, ফুটে উঠছি না।"

সকলে হেসে ওঠাতে সমীর ঘোষ আবার বলল, "প্রকৃত সংগ্রাম আমাদের এখনও শুরু হয় নি। দেরী আছে। প্রকৃত সংগ্রাম হলো সাধারণ মানুষের অধিকারের সংগ্রাম। একদিন আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। আমরা হঠাৎ দেখব শিব গড়তে গড়েছি বাঁদর। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় দেখব ধনতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমাসীন। গণতন্ত্রের পোশাক পরে দেখব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধনীদের রাজত্ব। তখন আমাদের নজর খুলবে। তখন ভারতবর্ষে হবে প্রকৃত সংগ্রাম। আজ আমাদের কারুর দল বেছে নেবার দরকার নেই তখন দরকার হবে। তখন জীবন নিজেই প্রশ্ন করবে তুমি কোন দলে? অনেকের দলে, না কয়েকজনের দলে? তখন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী; বৈজ্ঞানিক, সবাইকে দল বেছে নিতে হবে। এখন আমরা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ সবকিছুকে গালাগালি দিই। আমেরিকা ও রাশিয়াকে এক মানদণ্ডে বিচার করে নিজেদের অদলীয় নিরপেক্ষতার বাহাদুরী দেখাই। দম্ভ করে বলি অথবা কোনও দলে নই, সকলের কাছ থেকে তাই আমরা ননীর জন্যে হাত পাতি। আজ সবাই

আমাদের মিত্র। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে পশ্চিমের ধনতন্ত্র, প্রাচ্যের সাম্যবাদ। এমন দিন চিরকাল থাকবে না। ইতিহাসের নিয়মে আমাদের দল বেছে নিতে হবে। তখন আমরা নতুন সাহিত্য লিখব, আমাদের অর্থনীতি, জীবনদর্শন অন্যরকম হবে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে, অন্য লক্ষ্যে চলবে।"

সমীর ঘোষের এই সোচ্ছ্বাস উক্তি সেদিন কনট প্লেসের ভোজন-সভায় লঘুহাস্যে উপহসিত হইয়া সভায় সমাপ্তি টানিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উত্তেজিত উচ্ছ্বাসেরও দৌড় এই পর্যন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও কখনই একেবারে থামিয়া থাকে না। যাহাকে মনে হয় হঠাৎ পরিবর্তন, তাহাও হঠাৎ ঘটে না। নানা বিসর্পিত পথে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা দিয়া তাহা ইতিহাসের উদ্দেশ্য-সাধনের অভিমুখে পদক্ষেপ করিতে থাকে। মহৎ শিল্পীর দিব্যদৃষ্টিতে এই অজানা-পথের পথিকদের পাদচারণ প্রতিফলিত হয়। ইহার জন্য মহৎ শিল্পীদেরও প্রয়োজন হয় জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার। বর্তমান ভারতে বুদ্ধিজীবীদের জীবনের পরিধি যতটা বিস্তৃত তাহারই চৌহদ্দীকে মানিয়া লইয়া চাণক্য সেন "সে নহি সে নহি" উপন্যাসে যে সত্যনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল সমাজ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যে, ও গল্পগঠনের উৎকর্ষে বর্তমান যুগের অবসানেও ইহাকে পৌছাইয়া দিবে ভবিষ্যৎ যুগের মানসলোকে।

১৭ই মার্চ, ৬৩ — নীরেন্দ্রনাথ রায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইংরেজি) সম্পাদনা, পুলিন বিহারী সেন। প্রকাশন শ্রীমতী ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েণ্টাল আর্টের সম্পাদিকা। ১৯৬১। দাম ১৬-বা ২১- টাকা।

দিন যত যাচ্ছে ততই অবনীন্দ্রনাথের সত্যকার পরিচয় তাঁর পরবর্তীকালের কাছে স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও। নিজের সাহিত্য-সৃষ্টিতে জীবিতকালেই যিনি দীপ্যমান সে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তা আজ যেমন আমাদের কাছে এক বিস্ময়, তেমনি নিজের শিল্পসৃষ্টিতে জীবিতকালে যিনি সর্বমান্য শিল্পগুরু সেই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতিত্বও আজ আমাদের সকলের চক্ষে এক অপরূপ প্রকাশ। আর কয় বৎসর পরেই (১৯৭১) তাঁর জন্ম শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসবেরও দিন আসছে, এ কথাটা এখন থেকে স্মরণ করা বাঙালীর ও ভারতবাসীর কর্তব্য—ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব দি অরিয়েণ্টাল আর্ট

সমিতির গোল্‌ডেন জুবিলী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তাঁদের জর্নালের এই বিশেষ সংখ্যা (নবেম্বর ১৯৬১) 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র নামে উৎসর্গ করায় সেই কথাটা আমাদের অন্ততঃ মনে পড়ে গেল।

ইং ১৯০৭ সালে সোসাইটির জন্ম। সে কাহিনীও আজ ইতিহাস, স্মরণ করবার মতো গৌরবের ইতিহাস। এলো-পাথারি আর্ট-বিলাসের ধোঁয়ায় সোসাইটি অদৃশ্য প্রায় বলেই আরও স্মরণীয় তার স্মৃতি, তার কীর্তি, তার আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক কাহিনী, শেষে সার্থকতার মধ্যে তার প্রায় জরাবসাদের বেদনাদায়ক কথাও। সমিতির কথাও গ্রন্থখণ্ডে কতকটা বিবৃত হয়েছে নানা লোকের লেখায় ও উদ্ধৃতিতে,— অবনীন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী, জেমস-এ-কাজিন্‌ প্রভৃতির। তার জরতার পর্বটা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে কেউ উদ্‌ঘাটন করলে সম্ভবতঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার অবনীন্দ্র-কীর্তির বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। আমরা অবশ্য মনে করি কালের গুণে সোসাইটিতে জড়তা এলেও ভারতশিল্পের আবিষ্কার মিথ্যা হয় নি। এবং আমাদের জাতীয় আত্মবোধের ও শিল্প-চেতনার নবোদ্বোধনের ইতিহাসে তাই সোসাইটির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ এই নব্য ভারতীয় শিল্পকলার গুরু বলে পরিচিত তাই এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রধানতঃ তাঁরই কথা। অবশ্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় নিশ্চয়ই শুধু এই নয় যে, তিনি সেই শিল্প আন্দোলনের গুরু। বিনোদ বিহারী বাবুর এই কথা অত্যন্ত সত্য। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের বা রিভাইল্‌ভ্‌-এর প্রয়াস এই নব্য-ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে যে দেখা দেয়, তা কিন্তু স্বীকার্য, এবং অবনীন্দ্রনাথ চান বা না-চান, সেই 'পুনরুজ্জীবনের' পুরোধা বলতে দেশে তাঁকেই বোঝায়। নিঃসন্দেহ, তাঁর অপেক্ষা সেই প্রাচীন ঐতিহ্য বেশি প্রাণ লাভ করে তাঁর প্রধান শিষ্য শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর সে সময়কার কর্মে। এবং আরও সত্য এই যে, নন্দলালের কীর্তিও পুনরুজ্জীবন নয়, প্রাণের পুনরুদ্বোধন। অর্থাৎ তিনিও ঐতিহ্যের আবৃত্তি করেন নি, তা নবায়িত করেছেন। আর তারপর নব-নব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের নিয়মে ভারতীয় শিল্পের এমন-এক আধুনিক অধ্যায়েরও উদ্বোধন করেছেন—যা বিচিত্র, অভিনব, বহুঐশ্বর্যবান্‌, অথচ ঐতিহ্যবান্‌, যা স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রাণস্পর্শ হারিয়ে আপনাকে হারাতে চায় নি। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা তাঁর শিষ্যদের পক্ষে এই বন্ধনমুক্তির ক্রমিক সাধনা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার পরিচয় তাঁর নিজের কথায় ও শিল্পরসিকদের কথায় এই অবনীন্দ্র সংখ্যা গ্রন্থটিতে শ্রীপুলিন বিহারী সেনের সযত্ন সম্পাদনায় সার্থক হয়ে উঠেছে। লোভ থেকে যায় বিশদ আলোচনায় এই অবনীন্দ্র-পরিচয় পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতে। তা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে আর দেরী না করে শুধু এই অবনীন্দ্রসংখ্যার বিবিধ বিষয় ও চিত্রাদির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আপাততঃ সম্ভব।—প্রথমেই চিত্রের কথা বলি—অবনীন্দ্রনাথের ১৪খানা চিত্র এগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তা সামান্য নয়, কিন্তু সমগ্র অবনীন্দ্র-কীর্তির তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু হায়, সেই সমগ্র কীর্তিও তো আর লভ্য নয়। যা নানা দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাবও এখন দুষ্প্রাপ্য। তবু এই গ্রন্থে কিছু আছে আলেখ্য, আর কিছু নানা বয়স ও রীতির পরিচয়বাহী দান—সেই প্রথম যুগের 'ভারতমাতা', থেকে শেষযুগের একখানি 'কুটুম-কাটম' পর্যন্ত (এক-আধটি 'মুখোস' কি দুর্লভ হয়েছে ?)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা যাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁদেরও অনেকের মনে জাগবে 'শাহাজানের মৃত্যু'র মতো কোনো কোনো চিত্রের সম্মুখে বসে পূর্বতন এক যুগের অপূর্ব শিহরণ। সেই সঙ্গে আছে নন্দলালের দু'খানা চিত্র—অবিস্মরণীয় আলেখ্য (?) চিত্র 'অবনীন্দ্রনাথ', মুকুলদের আলেখ্য, আর 'ফাল্গুনী'-'ডাকঘর'আদির অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ, ও কিছু-কিছু প্রাচীন ভারতীয় ভঙ্গি নিদর্শন, প্রভৃতি। চিত্র ছাড়া আছে ইংরেজী অনুবাদে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ ('সাদৃশ্য', 'ষড়ঙ্গ', 'মূর্তি' প্রভৃতি) এবং 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি থেকে কিছু-কিছু স্মৃতি-কথার অংশ। এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মৌলিক রচনা আছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ; অবনীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রমথ নাথ বিশীর, তাঁর অখণ্ড শিল্প-সাধনার আলোচনা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। প্রত্যেকটিই মূল্যবান্।

এই রেখা ও লেখার পরম রসিক শিল্পীর কথা দেখতে দেখতে বারবারই মনে হলো—শতবার্ষিক জয়ন্তীর জন্য আমরা যেন প্রস্তুত হই এখন থেকে।

স্বদেশীসমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্কলন ও সম্পাদনা : শ্রীপুলিন বিহারী সেন। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

পরিচয় অনাবশ্যক। আবশ্যক ছিল 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ও তৎসম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের অন্য প্রবন্ধের অংশ সমূহের এরূপ সঙ্কলন। এখানে তা একসঙ্গে পেয়ে পাঠক কৃতার্থ হবে। কিন্তু মাত্র ১২৫ পৃষ্ঠার একখানা বইএর দাম তিনটাকা হলে পাঠকের কৃতজ্ঞ হবার কারণ নেই।

গোপাল হালদার



সূচীপত্র